জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বিতীয় পুস্তক

Approved by C. T. Book Committee for Juvenile Reading)

বিচিত্র এই সৃষ্টি

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

BIROHANDRA PUBLIC LIBRARY AGARTALA
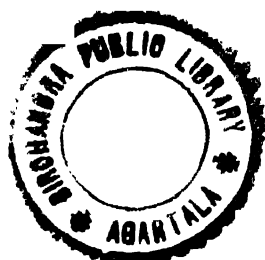
বেঙ্গল ম্যাস্ এডুকেশন সোসাইটি
৯৯।১ এফ্, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার
কলিকাতা, ৪

মূল্য—।।০
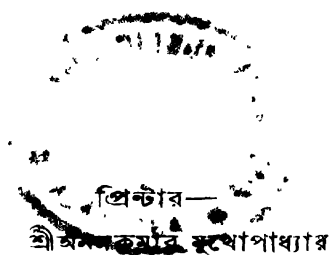
ভূমিকা

পরমাণুপুঞ্জ হইতে এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল, মানুষ কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিল, সেই কথা ছেলেদের মত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা এই পুস্তকখানিতে করিয়াছি। আমাদের দেশে এই বিষয়ের আলোচনা বড়ই অল্প, সেই জন্য আলোচনা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার অপেক্ষা গুণীদিগের এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমল হোম মহাশয় আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত অতি যত্নে দেখিয়া দিয়াছেন। ছেলেদের যদি পুস্তকখানি ভাল লাগে, তাঁহার গুণেই ভাল লাগিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতি—

গ্রন্থকার।

তৃতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণে সৃষ্টির ক্রমগুলি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নূতন একটি অধ্যায় যোগ করা হইল এবং বহু নূতন চিত্র দেওয়া হইল। আশা করি সৃষ্টির মূল সূত্রগুলি বুঝিতে পুস্তকখানি সাহায্য করিবে।

ইতি—

শ্রীপঞ্চমী ১৩৫২

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

বিচিত্র এই সৃষ্টি

বিজ্ঞান ভিক্ষু

Saumyen

অতীত

কথা কও, কথা কও

অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন চেয়ে বসে রও।

কথা কও, কথা কও।

যুগ যুগান্ত ঢালে তা'র কথা তোমার সাগর তলে,

কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে।

সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,

কল কল ভাষ নীরব তাহার,

তরঙ্গ হীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও।

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।

—রবীন্দ্রনাথ—

বিচিত্র এই সৃষ্টি

১

বিশ্ব ও পৃথিবী

"সংখ্যা চেদ্রজসমস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন"

—দেবী ভাগবৎ

রাত্রের আকাশ

রাত্রে আমরা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতে দেখি। আমাদের পৃথিবীও তাহাদেরই মত একটী নক্ষত্র, কিন্তু আকারে অতি ক্ষুদ্র। তবে সামান্য প্রভেদ আছে।

আকাশে যেগুলিকে আমরা জ্বলিতে দেখি, সেগুলি বিরাট জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলী। সেস্থানে আমাদের মত জল, বায়ু ও মৃত্তিকপুষ্ট কোন জীব জন্মিতে পারে না। সূর্য্যের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পর আমাদের পৃথিবী অবিরাম তেজ বিকীরণ করিতে থাকায়, উহার উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া পড়িয়াছে; সেইজন্য উহা আর জ্বলে না। কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে ইহাও যে জ্বলন্ত অবস্থায় মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন ইহার উপরিভাগে সূর্য্যের তেজ, তাপ ও আলোকের আশ্রয়ে আমাদের মত জীবকুলের বাস করা সম্ভব হইয়াছে।

ভূগর্ভের তাপ

পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হইলেও ভূগর্ভে নামিলে বেশ তাপ অনুভূত হয়। কিবা খরতপ্ত মরুভূমিতে, কিবা তুষারশীতল মেরুপ্রদেশে, যে স্থানেই

সৌরমণ্ডল

মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রের যে-দলে আমাদের পৃথিবী ভ্রমণ করে, উহাদের মধ্যে সূর্য্যই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ফলে সূর্য্যই পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তাহা না হইলে উহা দল ছাড়িয়া মহাকাশে ছুটিয়া পলাইত। এই আকর্ষণকেই মাধ্যাকর্ষণ বলে। আমাদের পৃথিবীর উপরিস্থ সকল পদার্থই, এই মাধ্যাকর্ষণের ফলেই আকাশে ছুঁড়িয়া দিলেও, পুনরায় পৃথিবীবক্ষেই ফিরিয়া আসে। দলের অন্যান্য তারকাগুলিকে সূর্য্য এই মাধ্যাকর্ষণ বলেই টানিয়া রাখে, দল ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতে দেয় না।

দলের এই তারকাগুলি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়া উহাদিগকে গ্রহ বলে। আবার যে তারকাগুলি কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলিকে উপগ্রহ বলে। সূর্য্যের গ্রহ, উপগ্রহ লইয়া যে পরিবার, উহার নাম সৌরমণ্ডল।

আমাদের এই সৌরমণ্ডলের বিরাট অগ্নিস্তূপরূপ সূর্য্যেকে আটটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে দুরত্বানুসারে বৃহৎ গ্রহগুলির নাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস ও নেপচুণ। প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহকে আমরা চন্দ্র বলিয়া জানি। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ধূমকেতু ও অসংখ্য উল্কাখণ্ডও এই সৌরমণ্ডলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সূর্য্য সৌরমণ্ডলের প্রাণস্বরূপ

এই সৌরমণ্ডলের প্রায় কেন্দ্রে বসিয়া সূর্য্য তাহার পরিবারের প্রত্যেকটির প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই বৃহৎ পরিবারের সূর্য্যই

প্রাণস্বরূপ। সূর্য্যের আলোক, তাপ ও তেজ ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও পৃথিবীতে বাঁচিতে পারি না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রাণস্বরূপ সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

সূর্য্য হইতে গড়ে বুধ ৩৬০ লক্ষ মাইল, শুক্র ৬৭০ লক্ষ মাইল, মঙ্গল ১৪১০ লক্ষ মাইল, বৃহস্পতি ৪৮৩০ লক্ষ মাইল, শনি ৮৮৬০ লক্ষ মাইল, ইউরেণাস ১৭৮২০ লক্ষ মাইল, নেপচূণ ২৭,৯৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সকলের পক্ষে এই ব্যবধানগুলির ধারণা করা সম্ভব নহে, সেইজন্য একটী ক্ষুদ্র উপমা দিয়া বুঝাইতেছি।

সৌরমণ্ডলের আনুপাতিক ধারণা

আমাদের পৃথিবী যদি একটি এক ইঞ্চি বল• হইত, তাহা হইলে সূর্য্যের আকার হইত একটী ৯ ফুট গোলক এবং পৃথিবী হইতে উহা ৩২৩ গজ দূরে থাকিত। চন্দ্রের আকার হইত একটী ক্ষুদ্র মটরের মত। বুধকে সূর্য্য হইতে ১২৫ গজ দূরে $\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি একটী গুলিরূপে ঘুরিতে দেখা যাইত। শুক্র $\frac{২}{৩}$ ইঞ্চি একটি বড় 'টল-'

গুলির আকারে সূর্য্য হইতে ২৩৩ গজ দূরে ঘুরিতে থাকিত। মঙ্গল একটি ছোট বল রূপে ৪৯০ গজ দূরে, বৃহস্পতি ১২ ইঞ্চি 'গ্লোব'রূপে প্রায় এক মাইল দূরে, শনি আকারে প্রায় এইরূপ কিন্তু দুই মাইল

দূরে, ইউরেনাস চারি মাইল দূরে এবং নেপচুণ ছয় মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত। এই অনুপাতে নিকটতম জ্বলন্ত তারকাও থাকিত, সূর্য্য হইতে প্রায় ৫০, ০০০ মাইল দূরে।

পৃথিবীর তিনটি গতি

এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহের মধ্যস্থলে কেবলমাত্র বিশাল শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। আমাদের পৃথিবী, ২৪ ঘন্টায় একবার মাত্র, লাট্টুর মত সম্পূর্ণ পাক খায়; তাহারই ফলে হয় দিনরাত্রি।
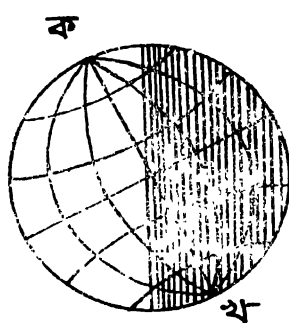
১ নং মেরুপ্রদেশে দিন রাত্রি
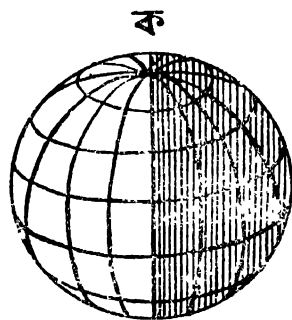
২ নং বিষুবরেখায় দিন রাত্রি

পূর্ণ এক বৎসরে পৃথিবী সূর্য্যকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করে, ফলে দেখা দেয় নানা ঋতু। এইরূপ প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহের আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট কাল আছে।
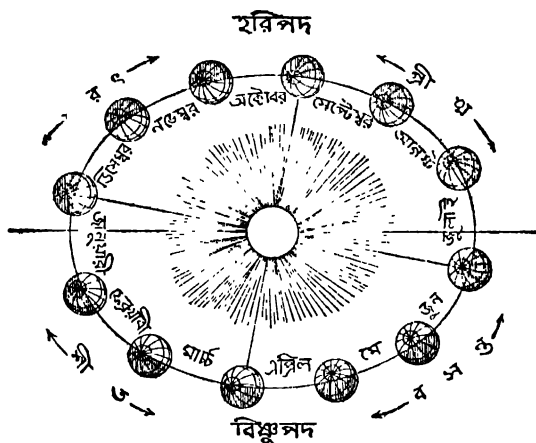
পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ পথ

আবার এই সমস্ত পরিবারবর্গ লইয়া সূর্য্য, প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে, মহাকাশে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।
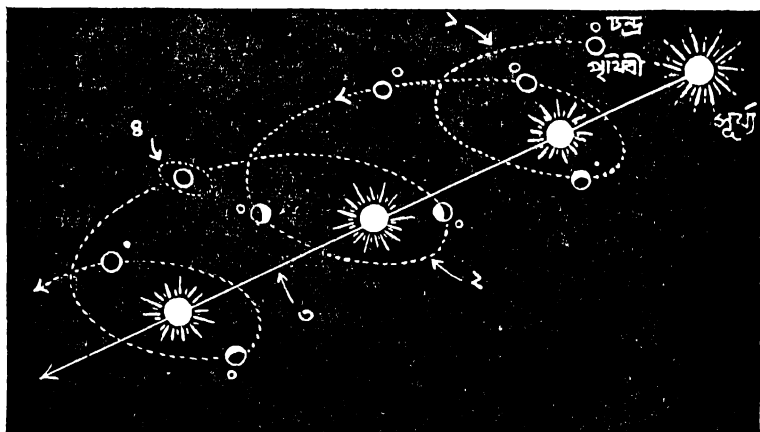
সূর্য্যের গতিপথ

পৃথিবী প্রথমতঃ ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রায় ৩৬৫।০ দিনে, প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে ১৮॥০ মাইল বেগে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল বেগে মহাকাশে সূর্য্যের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না কেন?

বেশ কথা। দুইটি ট্রেন, পাশাপাশি, একই বেগে ছুটিতেছে। একটিতে তুমি বসিয়া আছ, অপরটীতে তোমার এক বন্ধু বসিয়া আছেন। একই বেগে দুইটী ট্রেণ ছুটিবার ফলে, তোমরা একে অপরকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিয়া যাইতে পারিতেছ না। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে ট্রেণ দুইটী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে? নিশ্চয়ই তাহা নহে। ট্রেণে বসিয়া তোমরা উভয়েই ট্রেণের বেগে ছুটিতেছ, সেইজন্য এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপই ঘটে। পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা পৃথিবীর এই তিনটী বেগেই মহাকাশে ছুটাছুটি করিতেছি; সেইজন্য পৃথিবীর গতির পৃথক অনুভূতি ঘটে না।

সৌরমণ্ডলে জীবকুলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা

আমাদের পৃথিবীর মত কি সকল গ্রহ উপগ্রহেই জীবকুল বাস করে? ঠিক করিয়া বলা বড় শক্ত। বুধ সূর্য্যের অতি নিকটে; ফলে ইহার বায়ুমণ্ডল থাকিলেও উহা এতই উত্তপ্ত যে, উহাতে আমাদের মত প্রাণীর বাস একেবারেই অসম্ভব। শুক্রে বায়ুমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহা সূর্য্যের তত নিকটেও নহে। ইহাতে জীবকুলের বাস সম্ভব, কিন্তু ইহার বাষ্পঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া দৃষ্টি

চলে না; সেইজন্য নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। আমাদের প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহে, পৃথিবীর মত জীবকুলের বাস করা অসম্ভব নহে।

বৃহস্পতি, শনি, ইউরেণাস ও নেপচুণ পৃথিবী অপেক্ষা বহু গুণ উত্তপ্ত ও আকারেও বৃহৎ। শীতল হইয়া উহাদিগের পৃষ্ঠদেশে কঠিন ত্বক দেখা দিয়াছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উঁহাদিগের বায়ু এতই বাষ্পঘন যে সূর্য্যের কিরণ উহা ভেদ করিয়া উহাদিগের ভূপৃষ্টে না পৌছানই সম্ভব। আমাদের জানা কোন জীবকুল এই গ্রহগুলিতে বাস করে বলিয়া বোধ হয় না।
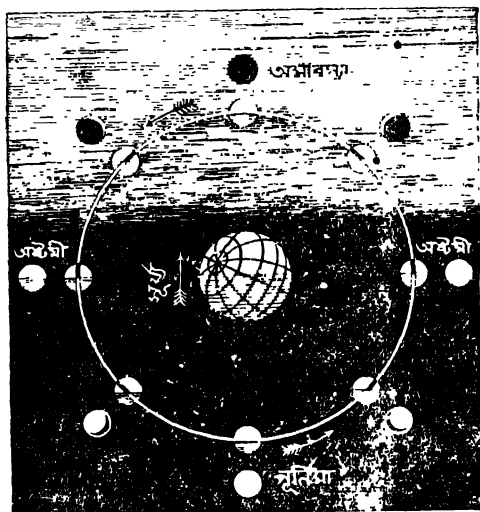
চন্দ্র

চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার প্রায় ২৯ দিন লাগে। যে চক্রপথে, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ২৩৯,০০০ মাইল। চন্দ্রে কোন বায়ুমণ্ডল

নাই, সেইজন্য মনে হয় ঐ স্থানে কোন জীবের বাসও নাই। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে চন্দ্রে বহু মৃত আগ্নেয়গিরি দৃষ্টিতে পড়ে। পৃথিবীর মত ইহারও নিজস্ব আলো দিবার ক্ষমতা নাই। সূর্য্যের আলোই, চন্দ্রের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া, পৃথিবীতে জ্যোৎস্নারূপে দেখা দেয়। চন্দ্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, পৃথিবীর অতি নিকটে বলিয়া শুক্ল পক্ষের প্রথমেই, ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জোয়ার ভাঁটা

প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণেই সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার
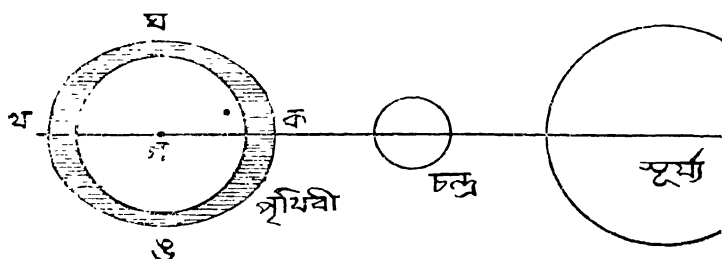
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলিত আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটার রেখা চিত্র।

ভাঁটা খেলে। সূর্য্য আকারে বহুগুণ বৃহৎ হইলেও, বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া, এই জোয়ার ভাঁটায় তাহার প্রভাব অতি সামান্য।

বিশ্বের বিশালতা

নগ্নচক্ষে বা দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে যে বিরাট আলোকময় বিশ্ব রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যে আমাদের সৌরমণ্ডল

একটী আলোকবিন্দু মাত্র। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে যে সূর্য্যসম জ্বলন্ত তারকাটি আছে, তাহা হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌছিতে প্রায় সাড়ে চারি বৎসর লাগে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৮,০০০ মাইল ছুটে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে সাড়ে চারি বৎসরে আলোক কতদূর ছুটিতে পারে। আমেরিকার অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণে এমন তারকাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যাহার আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে পাঁচ কোটী বৎসর লাগে।

জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহার দূরবীক্ষণে, আকাশ দেখিতে দেখিতে, হয়ত কোন এক মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইলেন যে, মহাকাশের এক কোণে এক বিন্দু আলোক ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া মিলাইয়া গেল। দেখার সময়ে আলোকের উৎস বর্ত্তমান থাকিলে আলোক ঐরূপ ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া মিলাইয়া যাইত না; সর্ব্বদাই ঐ কোণে আলোকবিন্দুটী অন্যান্য নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিত। ঐ আলোকবিন্দুর গতি ও প্রকৃতি হিসাব করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মহাকাশের অতি দূর অংশে, প্রচণ্ড বেগে ধাবমান দুইটী মৃত ও নিস্প্রভ নক্ষত্র-পিণ্ডের সুদূর অতীতে দৈবাৎ সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ফলে উভয়েই চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায়, উহাদিগের পরমাণুপুঞ্জ মহাকাশে ছড়াইয়া পড়িল এবং ঐ সংঘর্ষজাত তেজের একাংশ আলোকরূপে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্বে যাত্রা সুরু করিয়া দিল। ঐ অলোকবিন্দুই, আমাদের দূরবীক্ষণে ক্ষণিকের জন্য ধরা দিয়া, মহাকাশে আবার মিলাইয়া গেল। যখন আলোক ধরা পড়িল তখন ঐ নক্ষত্র দুটীর অস্তিত্বই ছিল না। বোধ হয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। নক্ষত্র দুটি পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইল, কিন্তু অবিনাশী তেজরূপ আলোকণা জন্মিয়াই যে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ছুটার আর শেষ নাই। সেই জন্য

কোটী বৎসর পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বার্ত্তা ঐ আলোক-বিন্দু আজ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়া গেল।

এক একটী তারকা এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। কোটী কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই বিরাটের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। বরং ধূলিকণারও সংখ্যা হয়, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।

পৃথিবীর জন্ম ও শৈশব

"যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে"

—ঠাকুর রামকৃষ্ণ

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মূলে এক

হাঁড়ির একটী ভাত টিপিলেই হাঁড়ির ভাতের সংবাদ পাওয়া যায়। পৃথিবীর পরিচয় হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কিছু আভাস আমরা পাই।

আগ্নেয়গিরির পরিচয় হইতে মনে হয় পৃথিবীর গর্ভদেশ অতি উত্তপ্ত। ভূ-কেন্দ্র হইতে যতই উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাপ কমিতে থাকে। খনিগর্ভে নামিতে নামিতে ইহার পরিচয় পাই। উপরিভাগ হইতে যতই ভূ-কেন্দ্রের দিকে নামি ততই তাপ বৃদ্ধি পায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ মাইল নীচে নামিলে কেন্দ্রে পৌছিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতি ৬৬ ফুট অন্তর ভূগর্ভে এক ডিগ্রী করিয়া তাপ বাড়ে, তাহা হইলে ৪০০০ মাইল নিম্নে ভূ-কেন্দ্রে তাপের আনুমানিক পরিমাণ হিসাব করিলেই পাওয়া যাইবে।

ভূ-কেন্দ্রে সকল পদার্থই গলিত অবস্থায় থাকা সম্ভব, কিন্তু কেন্দ্রের উপরিস্থ পদার্থরাশির ভীষণ চাপে অতি তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। উপরিস্থ চাপ কোন প্রকারে অপসারিত হইলেই উহা পুনরায় তরলরূপ ধারণ করে। ইহার পরিচয় আমরা আগ্নেয়গিরির গলিত প্রস্তর বমনে পাইয়া থাকি।

নীহারিকা

আকাশের কোন কোন অংশ জ্বলিতে দেখা যায়। ঐ অংশগুলির নাম নীহারিকা। উহা দেখিয়া মনে হয় আকাশের ঐ অংশে, বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া, অতি উত্তপ্ত ধূমকুণ্ডলী আলোক দিতেছে। কিংবা ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড, প্রচণ্ডবেগে ছুটাছুটির ফলে, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া প্রভাময় রূপ ধারণ করিয়াছে। অথবা একটী অতি উত্তপ্ত ঘনপিণ্ড কেন্দ্রে থাকিয়া আলোক বিকীরণ করিতেছে, এবং অপেক্ষাকৃত শীতল ধূমকুণ্ডলী উহাকে ঘিরিয়া থাকায় একটা জ্বলন্ত ধূমমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

নীহারিকা হইতে সৌরমণ্ডলের জন্ম

কোনকালে আমাদের এই সৌরমণ্ডল ঐরূপ একটী নক্ষত্রপিণ্ড ছিল। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, সেই অবস্থায় মহাকাশের এক বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অসংখ্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে ছুটাছুটি করিত। অধিকাংশ উল্কাপিণ্ড মাধ্যাকর্ষণের ফলে ক্রমশঃ সমষ্টি উপাদানের কেন্দ্রাভিমুখে আসিয়া জড় হইল। এই অতি উত্তপ্ত কেন্দ্রীয়পিণ্ডের (nucleus) চারিপাশে অপেক্ষাকৃত শীতল ধূমমণ্ডল উহাকে আবৃত করিয়া রাখিত। কেন্দ্র-পিণ্ড সামান্য শীতল হওয়ায়, প্রভার অল্পতা হেতু, এই ধূমাবরণ একটু কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত।

গ্রহ উপগ্রহাদির জন্ম

উক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল বহিরাবরণ কালে অধিকতর শীতল হওয়ায়, সঙ্কুচিত হইয়া কেন্দ্র-পিণ্ডের বেষ্টনীরূপে কয়েকটী বিভিন্ন অঙ্গুরীয়কে পরিণত হইল। যুগযুগান্তরে প্রত্যেক বেষ্টনীটী অধিকতর সঙ্কুচিত ও

শনির তিনটি পিণ্ডমালা

ঘনীভূত হওয়ায় কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং মাধ্যাকর্ষণপ্রভাবে অঙ্গুরীয়কগুলি বা পিণ্ডমালা সঙ্কুচিত হইয়া অতিতপ্ত কয়েকটী ঘূর্ণয়মান লাটুতে পরিণত হইল।

কুম্ভকারের চক্রে মাটীর তাল দিলে, উহার ঘুর্ণির ফলে যেমন মৃত্তিকা-পিণ্ড বর্ত্তুলাকার ধারণ করে, ঠিক সেইরূপ ব্যাপার মাধ্যাকর্ষণের ঘূর্ণির ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে। কালে ঐ অঙ্গুরীয়কগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘন বর্ত্তুলপিণ্ডে পরিণত হওয়ায়, অত্যুজ্জ্বল কেন্দ্র-পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। উক্ত কেন্দ্রস্থিত অতিতপ্ত পিণ্ড হইল সূর্য্য, এবং চতুর্দ্দিকস্থ ভ্রাম্যমান ঘনীভূত ও অপেক্ষাকৃত শীতল পিণ্ডগুলি হইল সৌরমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহাদি।
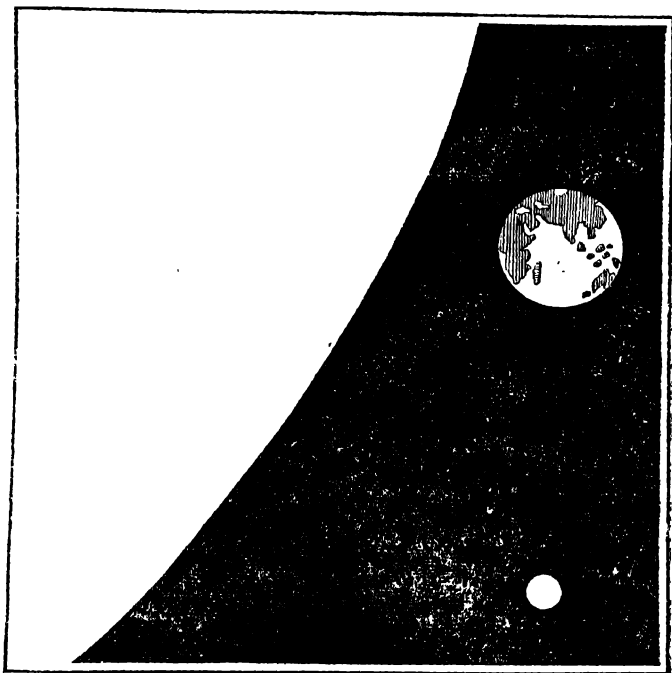
সূর্য্যগাত্রে পৃথিবীর ও চন্দ্রের আনুপাতিক আকার।

অন্য একদল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, একটি নীহারিকার বিস্তীর্ণ অতি সূক্ষ্ম পদার্থরাশির কতকাংশ স্তূপীকৃত হইয়া যখন একাকী জ্বলন্ত ধূমকুণ্ডলীরূপে মহাকাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তখন দৈবক্রমে ঐ নীহারিকারই অপর একটি ঐরূপ পথহারা জ্বলন্ত বৃহত্তর ধূমকুণ্ডলী ছুটিতে ছুটিতে উহার নিকটস্থ হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল যেরূপ ফাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ এই সাক্ষাতের ফলে মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে আমাদের ঘন ধূমময় সূর্য্যের আকার ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ে অধিক-

সূর্য্যের জ্বলন্ত ধূমকুণ্ডলী রূপ

তর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আমাদের সূর্য্যের কতকাংশ বিশাল ভাবে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া, মূলপিণ্ড হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া, মহাকাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র খণ্ডপিণ্ডের পৃথক সত্তারূপে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর অশুভ ধূমকেতুর মত আগন্তুক ধূমকুণ্ডলীটি দূরে সরিয়া গেলে, কালে উক্ত
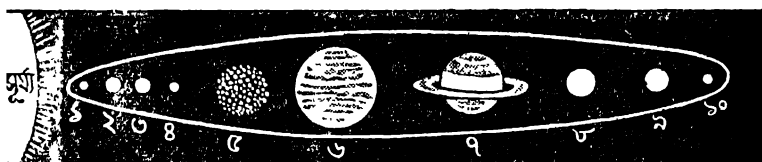
ছিন্নভিন্ন ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলি মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান গ্রহ-উপগ্রহাদিতে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে কোন এক নক্ষত্রপিণ্ড হইতে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

লোকে বলিবে এত কথা তাঁহারা জানিলেন কি করিয়া? ইহা তাঁহাদের কল্পনাও হইতে পারে। লক্ষকোটী বৎসর আয়ু হইলেও যে নীহারিকাপুঞ্জ হইতে সৌরমণ্ডল সৃষ্টির ধারাবাহিক স্তরবিন্যাস চোখে পড়ে না, বিচিত্র সে সৃষ্টির কথা বৈজ্ঞানিক কেমন করিয়া আবিষ্কার করিলেন?

সৃষ্টির ছিন্ন সূত্রগুলি

১ম। দূরবীক্ষণে অসংখ্য নীহারিকা ও নক্ষত্রপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

২য়। মহাকাশের কোন কোন স্থানে কোন এক অত্যুজ্জ্বল তপ্ত কেন্দ্র-পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শীতল আবরণ ভাসিতে দেখা যায়।

৩য়। আমাদের সৌরমণ্ডলের শনিগ্রহের চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড গঠিত কয়েকটি পিণ্ডমালা দেখিলে সৃষ্টির পূর্ব্বোল্লিখিত ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা অধিকতর দৃঢ় হয়।

৪র্থ। বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে সৃষ্টির ছিন্নসূত্রের আরও কতকাংশের সন্ধান পাওয়া যায়।

৫ম। আমাদের পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি, সাগর, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদির প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে, বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত যে কবিকল্পনা নয়, তাহা বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না। আমাদের পৃথিবীকে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে যে যে স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল, মহাকাশে লক্ষ্য করিলে সৃষ্টিধারার ঐরূপ প্রতি স্তরটী কোন না কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপে সৃষ্টিশৃঙ্খলার বিভিন্ন পর্ব্বগুলি মহাকাশে নানাস্থানে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির ছিন্নসূত্রগুলি গাঁথিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীর ত্বক সৃষ্টি

আমাদের বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর জ্বলন্ত পিণ্ড যুগযুগান্তর ধরিয়া তাপ বিকীরণ করিতে থাকায়, ক্রমশঃ উহার উপরিভাগ কঠিন তপ্ত ধরিত্রীতে পরিণত হইল। উহার গর্ভস্থ সকল প্রকারের ঘন গুরু ধূম শীতল হইয়া

জমিয়া কঠিন হইবার পর, বাকী রহিয়া গেল জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের লঘু ধূমগুলি।
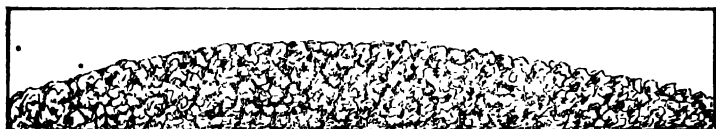
বর্ত্তুলাকার গ্রহের উপরের উপাদান জমাট বাঁধিতেছে।

সাগর ও হ্রদ সৃষ্টি

ক্রমশঃ পৃথিবী অধিকতর শীতল হইলে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমিয়া তপ্ত বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীবক্ষস্থ নিম্নভূমি পূর্ণ করিয়া

পৃথিবী-ত্বকের নিম্নভূমিগুলি হইল হ্রদ ও সাগর

সমুদ্র ও হ্রদ সৃষ্টি করিল। সে যুগে তপ্ত জলের সাগর হইতে ক্রমাগত তপ্ত বাষ্প উঠিয়া আকাশ আছন্ন করিয়া রাখিত। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তপ্ত বৃষ্টি ধারারূপে নামিয়া, পুনরায় তপ্ত বাষ্পরূপে উঠিয়া, আকাশ ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিল।

তখনও জল, বায়ু ও মৃত্তিকাপুষ্ট জীবকুল সৃষ্টির উপযোগী কাল উপস্থিত হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠ জুড়িয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবলীলা তখনও চলিতেছিল। ফলে কোন স্থানে গভীর সাগরের গর্ভদেশ উঠিয়া নূতন পর্ব্বতমালার সৃষ্টি হইতেছিল, আবার কোন স্থানে পর্ব্বতের উচ্চশিখর পৃথিবীগর্ভে নামিয়া গিয়া

নূতন সাগরের গর্ভদেশে আত্মগোপন করিতেছিল। ক্রমশঃ প্রকৃতির এই লীলা মন্দীভূত হইয়া আসিলে, তপ্ত গলিত পৃথিবী-পিণ্ডের উপর নানা কঠিন শিলা জমাট বাঁধিল। সাগর শীতল জলে পূর্ণ হইল। বায়ুমণ্ডল তপ্তবায়ুর ভারমুক্ত হইয়া জীবসৃষ্টির অনুকূল হইল।

মৃত্তিকা ও ভূত্বক

তাহার পর চঞ্চল বায়ুর আঘাতে পর্ব্বতের শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বৃষ্টিধারাজাত নদীস্রোতে শিলাচূর্ণ নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিয়া ক্রমশঃ জল ও বায়ুর আঘাতে, অতি সূক্ষ্মকণায় পরিণত হইল। এই সূক্ষ্ম প্রস্তরকণাগুলি, উচ্চভূমি হইতে জলের স্রোতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিয়া, ধরার কঠিন ভূশিলার উপরে ক্রমশঃ মৃত্তিকার স্তর গড়িয়া তুলিল। এইজন্য মৃত্তিকা খনন করিলে, কিছু পরেই, শিলাস্তর পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকাশিলাদিসম্বলিত এই শীতল আবরণকে ভূত্বক বলে। ইহা প্রায় ৫০ মাইল স্থূল।

এই ভূত্বকের নিম্নে কি আছে ?

আগ্নেয় ধূমকুণ্ডলী হইতে তরল পিণ্ডরূপ হইল, তাহার পর তাহাও ক্রমশঃ বর্ত্তুলাকার ও কঠিন আকার ধারণ করিল। ইহা হইতে মনে হয় ভূত্বক যে যে উপাদানে গঠিত, সেগুলি ব্যতীত পৃথিবীগর্ভে অপর কিছুই না থাকাই সম্ভব। প্রথমতঃ উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে আমাদের পরিচিত উপাদানগুলিই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক্, পৃথিবীর কেন্দ্রে কি থাকা সম্ভব।

খনিজ পদার্থ হইতে কোন ধাতু পৃথক করিবার জন্য গালাইলে দেখা যায়, গলিতধাতু গুরুভার বলিয়া পাত্রের নিম্নে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং অন্যান্য পদার্থ উহাদিগের আপেক্ষিক ভারানুসারে একের উপরে একটী ভাসিয়া উঠে। তাহা হইলে পৃথিবী যখন গলিত

অবস্থায় ছিল, তখন গুরু ধাতুগুলি সম্ভবতঃ কেন্দ্রে গিয়া জমা হইয়া থাকিবে এবং অন্যান্য লঘু উপাদানগুলি তাহার উপরে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া থাকিবে। ফলে সর্ব্বোপরি লঘু উপাদানগুলি শীতল হইয়া ধরাপৃষ্ঠে জীবকুলের বাসযোগ্য স্থান করিয়া দিয়াছে।

ভূগর্ভের উপাদান

স্বর্ণ লৌহাদি অপেক্ষা গুরুভার বলিয়া ভূকেন্দ্রে সঞ্চিত হইয়া এক বিরাট স্বর্ণ-গোলক গড়িয়া থাকিবে। তাহার উপর লৌহের মণ্ডল, তাহার উপর ভূত্বক, তাহার উপর জলমণ্ডল এবং সর্ব্বশীর্ষে বায়ুমণ্ডল ভাসিতেছে। ইহাই বোধ হয় আমাদের ধরিত্রীর আনুমানিক রূপ।
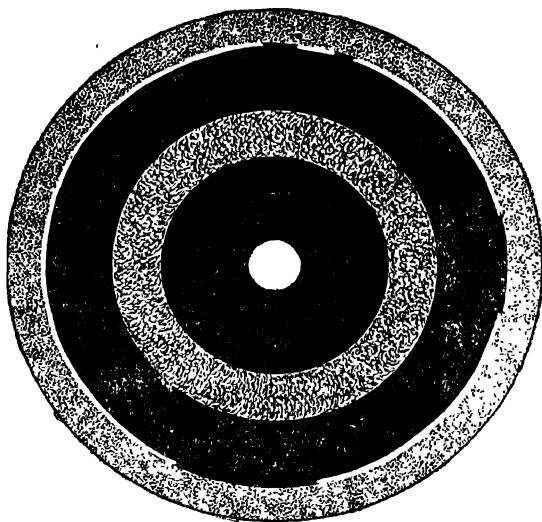
আমাদের ধরিত্রীর আনুমানিক রূপ

পৃথিবীর কেন্দ্রে যে স্বর্ণলৌহাদির মত গুরুভার ধাতুগুলি গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে তাহার অপর এক প্রমাণ বলি, শুন।

পৃথিবীর ওজন কথাটী শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, না? কিন্তু সত্যই পৃথিবীর ওজন লওয়া হইয়াছে। ইহার ওজন ৫,৮৫২, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ টন মাত্র! আমরা পৃথিবীর ঘন আয়তন জানি এবং ভূ-শিলার আপেক্ষিক ঘনত্ব (Specific gravity) আমাদের জানা আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবী কেবলমাত্র শিলায় গঠিত হইলে পৃথিবীর ওজন এত হইত না। অতএব ভূ-কেন্দ্রস্থিত উপাদান নিশ্চয়ই গুরুধাতুর পদার্থে গঠিত, সেইজন্য ইহার ওজন এত অধিক হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

৩

মৃত্তিকা সৃষ্টি

ভূ-ত্বকে গুরুভার ধাতু পাইবার কারণ

অতিতপ্ত গলিত ভূকেন্দ্রের উপর একখানি প্রায় ৫০ মাইল স্থূল ভূত্বক ভাসিতেছে। ভূত্বকের অধিকাংশ প্রস্তরে গঠিত। আগ্নেয়-গিরির যুগে নানা গুরুভার ধাতু ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূত্বকের স্তরে স্তরে স্থান লইয়াছিল। সেইজন্য ভূত্বকের কোন কোন স্তরে সামান্য স্বর্ণ বা লৌহাদি গুরু ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। ভূত্বকস্থ অঙ্গার বা খনিজ তৈল পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পরে সৃষ্টি হইয়াছিল।

গ্রানাইট প্রাচীনতম ভূ-শিলা

সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর উত্তপ্ত গলিত পিণ্ডের উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া যে একখানি আবরণ জমাট বাঁধিয়াছিল, সেই ত্বকখানির উপাদান আগ্নেয়শিলা (Igneous rock) বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান কালেও আগ্নেয়গিরিমুখ-নিঃসৃত গলিত-উপাদানরাশি শীতল হইয়া আগ্নেয়শিলা গঠিত হয়। এই আগ্নেয়শিলার মধ্যে গ্রানাইটই (Granite) প্রধান।

উল্লিখিত প্রাচীনতম ভূ-শিলা, ধরাপৃষ্ঠে সঞ্চিত জল ও বায়ুমণ্ডলের সহিত মিলিত হওয়ায়, প্রাণশক্তির রূপগ্রহণ করিবার আধার গঠিত হইল। কিন্তু তখনও ধরাপৃষ্ঠ এত উত্তপ্ত ছিল যে, যে উপাদানগুলির

মিলনে প্রাণশক্তির স্ফুরণ হইতে পারে, সেগুলির সম্মেলন সম্ভব ছিল না।

আগ্নেয় শিলা

তাহার পর তপ্ত ভূকেন্দ্র অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইল। ফলে উপরিস্থিত আগ্নেয় শিলাময় ভূত্বক কঠিন হইয়া পড়ায় স্থানে স্থানে শিলাস্তূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া হইতে লাগিল। তাহার উপর যুগযুগান্ত ধরিয়া বায়ুমণ্ডলের অক্সিজন (Oxygen), কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ, (Carbon-di-oxide), প্রবল বায়ুস্রোতবাহিত বৃষ্টি, তুষারপাত এবং সূর্য্যের তাপ মিলিয়া অতি কঠিন আগ্নেয় শিলাস্তূপের উচ্চশিখরগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মৃত্তিকায় পরিণত করিল। ইহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্য এক, কিন্তু উপায় বিভিন্ন।

বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আগ্নেয় শিলার কোন কোন উপাদানের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে তাপ জন্মে। তাপে প্রস্তরের প্রসারণ ঘটে, ফলে আগ্নেয়শিলা ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ বৃষ্টির জলের সহিত গুলিয়া ভূমিতে পড়ে। তাহার পর উহা, জলের সহিত, আগ্নেয় প্রস্তরের ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে। সে স্থানে উহা কোন কোন উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া চূণা পাথরের মত নূতন কোমল প্রস্তর গঠন করে। ক্রমশঃ ঐ কোমল পাথর গলিয়া গিয়া বিলাতের চেদার গর্জ (Cheddar gorge) ও গুহার মত বৃহৎ খাড়ি বা ফাটল গড়িয়া তুলে।

কথায় বলে 'ধীরে পানি পাথর কাটে'। প্রস্তরের গর্ত্তে বৃষ্টির জল জমিয়া ক্রমশঃ উহাকে ভঙ্গুর করে। তাহার পর বালুকাপূর্ণ প্রবল বায়ুস্রোতের ঝাপটায় পর্ব্বতগাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার উপর তুষারপাতের ফলে, পাহাড়ের ফাটলে সঞ্চিত বৃষ্টির জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। জল প্রস্তরের ভিতরে গিয়া বরফে পরিণত হইলে প্রসারিত হয়। এই প্রসারণের ফলে পাহাড়ের উপরিভাগ ফাটিয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পলিপাথর

ধরাপৃষ্ঠে জল ও বায়ুর মিলিত চেষ্টায় এইরূপে ভাঙ্গাগড়া চলিতে থাকে। পাহাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহাদের কাজ শেষ হয় না। উহারা অগ্নেয়শিলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মৃত্তিকা গড়ে। পাথরের গুঁড়া, জল ও বায়ুর স্রোতে বাহিত হইয়া নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিয়া, হ্রদ ও অল্পগভীর সাগরে সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ এই সঞ্চিত আগ্নেয়প্রস্তরচুর্ণ বা
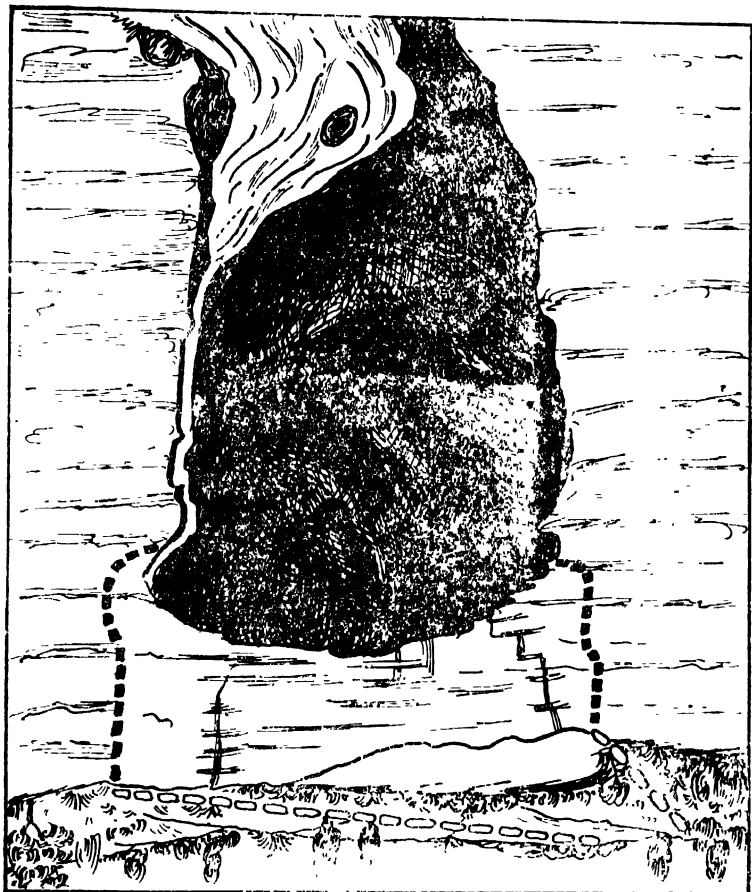
চেদার গর্জ্জের মত খাড়ি গড়িবার প্রথমাবস্থা : শিলা জলে গলিয়া গুহায় পরিণত হইয়াছে। উহার উপরিস্থ আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া পড়িলে, খাড়ির সৃষ্টি হয়। চিত্রে গুহার ভিতরে অন্তঃসলিলা নদী প্রবাহিতা, দেখা যাইতেছে।

মৃত্তিকাস্তর উপরিস্থ উপাদানস্তূপের- বিশাল চাপে চাপে জমাট বাঁধিয়া পলি পাথরে (sedimentary rock) পরিণত হয়। এই পলিপাথর

পলি পাথর

মানুষের বহু কাজে লাগে। বেলে পাথর, এঁটেলে মৃত্তিকা, খড়িমাটী, চূর্ণাপাথর, অঙ্গার ইত্যাদি পলিপাথরেরই প্রকারভেদ।

এঁটেল মৃত্তিকা

আগ্নেয় শিলার অতি সূক্ষ্মকণা কর্দ্দমস্তররূপে কোন স্থানে সঞ্চিত হইবার পর অত্যধিক চাপে পুনরায় ঘন জলহীন কঠিন উপাদানে পরিণত হইলে উহাকে এঁটেল মৃত্তিকা বলে। ইহার ভিতর দিয়া

জল গলিতে পারে না, ফলে বৃষ্টির জল ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া এঁটেল মৃত্তিকার স্তরের উপর সঞ্চিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ নদীহীন দেশে পৃথিবীগর্ভে এই সঞ্চিত জল ফোয়ারার মুখে উঠিলে, বা প্রয়োজনমত নলকূপ দিয়া তুলিয়া লইয়া, মানুষ আপনার তৃষ্ণা মিটায়। এই মৃত্তিকায় অতি উত্তম ইষ্টক প্রস্তুত হয়।

খড়ি মাটী ও চুণা পাথর

মৃত সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালরাশি সমুদ্রগর্ভে নামিয়া অবিরাম সঞ্চিত হওয়ায়, কালে উপরিস্থিত জলের বিশালভারে প্রস্তরীভূত হইয়া,
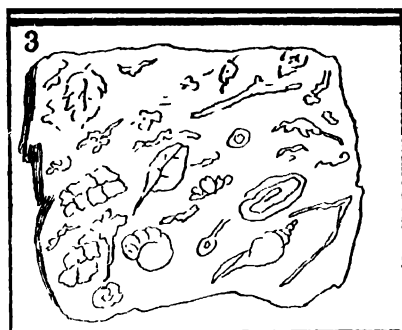
খড়ি মাটি

খড়িমাটী ও চূণাপাথরে পরিণত হইয়াছিল। চূণাপাথর না থাকিলে আমরা সিমেন্ট পাইতাম না।

অঙ্গার

অঙ্গারস্তর হইতে আমরা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় পাথুরে কয়লা পাই। কোন সুদূর অতীতে পুঞ্জীভূত মৃত উদ্ভিদ পলিপাথরের
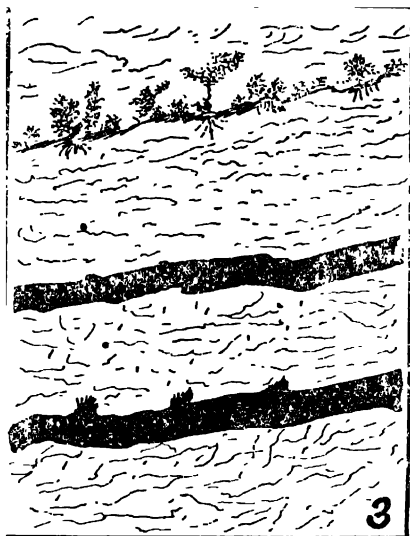
প্রস্তরীভূত উদ্ভিদের নাম অঙ্গার

বিশাল চাপে প্রস্তরীভূত হইয়া পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়াছিল।

লবণ

পাথরে যে লবণ ছিল তাহাই বৃষ্টির জলে ধুইয়া ধুইয়া নদীস্রোতে সমুদ্রে আসিয়া সঞ্চিত হইত। কোন অগভীর হ্রদ শুকাইয়া, রাজপুতানা প্রদেশের সম্বর হ্রদের মত, জলশূন্য হইয়া গেলে আমরা

লবণের স্তর দেখিতে পাই। আবার কোন স্থানে ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ভ উত্তোলিত হইয়া কালে শুষ্ক হইলে, সে স্থানেও লবণস্তর দেখা যায়।

পলিপাথরেরই স্তরে স্তরে জীবের প্রস্তরীভূত (fosilised) কঙ্কাল পাইয়া, সেই সেই যুগের কোন কোন প্রাণীদেহের পরিচয় আমরা পাই। আগ্নেয় ও প্রাচীন পলিপাথর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন পলিপাথরের গঠন আজিও থামে নাই।

ভাঙ্গাগড়া একই শৃঙ্খলার দুইটি অংশ

এইরূপ অবিরাম ভাঙ্গাগড়ার ফলে পর্ব্বতশিখর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং উহা প্রবল জলস্রোতে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলে, প্রস্তর-চূর্ণ স্তরে স্তরে জমাট বাঁধিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভ পূর্ণ হইয়া উঠে। কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে। তথাপি পৃথিবীর সকল উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতল হইয়া যায় নাই কেন?

কোন স্থানে পলিপাথরের স্তর ক্রমশঃ অতিশয় স্থূল হওয়ায় অতিরিক্ত ভারে তথাকার ভূমি বসিয়া যায়। আবার কোন স্থানে পর্ব্বতশিখর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহার ভার হ্রাস পাওয়ায়, পর্ব্বত ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলিয়া উঠে। এইরূপে ভাঙ্গাগড়ার কার্য্য যুগপৎ চলিতে থাকে। এইরূপ না হইলে মৃত্তিকারও সৃষ্টি হইত না। এবং কোমল মৃত্তিকা না পাওয়ায় উদ্ভিদ কোন কালেই জন্মিতে পারিত না। আর উদ্ভিদ না জন্মিলে প্রাণীর আবির্ভাবও ঘটিত না।

৪

প্রাণের আবির্ভাব

প্রাণ

প্রাণের লক্ষণ জানি, প্রাণের পরিচয় দিতে পারি, কিন্তু প্রাণ কি তাহা আমরা বলিতে পারি না। জীবন্ত দেহ কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। ঐ উপাদান সহযোগে প্রাণের আধাররূপ দেহও গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে জানি না।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন্ত দেহ অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উঁহা দেখিতে জেলি মোরব্বার মত। উহাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা গিয়াছে উহা অঙ্গার, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, অক্সিজেন ও জলের সম্মিলনে এক অতি জটিল পদার্থ। যে সকল পদার্থ জীবন্ত দেহে পাওয়া যায়, সেগুলিই পৃথিবীতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐগুলি প্রাণহীন! ঐগুলিকে কি উপায়ে সম্মিলিত করিলে, ঐ সম্মিলিত আধারে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারা যায়, তাহা আমাদের জানা নাই।

প্রোটোপ্লাজম্ সর্ব্বাপেক্ষা সরল জীবাধার

সর্ব্বাপেক্ষা সরল জীবন্ত আধারকে আমরা প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) বলি। যখন প্রথমে পৃথিবীতে প্রোটোপ্লাজম্ দেখা দিল, তখন পৃথিবীব অবস্থা কি ছিল ?

প্রোটোপ্লাজমের প্রথম অবস্থায় উহা তাপ বা শৈত্যের তীব্রতা সহ্য করিতে পারে না। ঐ সময় নিশ্চয়ই উক্ত প্রাণময় আধার জন্মিবার মত পৃথিবীর অবস্থা হইয়াছিল। আর্দ্র ও তপ্ত বায়ুমণ্ডলের আশ্রয়ে কর্দ্দমে ইহার জন্ম।

আদি প্রাণের আধার একটী মাত্র কোষ (Cell), একটী আবরণে ঢাকা, কিন্তু ইহাকে উদ্ভিদও বলা চলে না, প্রাণীও বলা চলে না। এইরূপ জীব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীতে প্রভেদ

উদ্ভিদে ও প্রাণীতে প্রভেদ কি? নিম্নতম শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীতে প্রভেদ ধরা বড় কঠিন। উচ্চ শ্রেণীতে আসিলে তবে প্রভেদ ধরিতে পারা যায়। প্রথম প্রভেদ, প্রাণী সচল, কিন্তু উদ্ভিদ স্থাবর জীব।

জীব মাত্রেরই বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে। কিন্তু শিলাখণ্ডও ত বাড়ে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, লোপ পায়; তবে শিলাখণ্ড প্রাণবন্ত নয় কেন? একখণ্ড শিলা দুইখণ্ড করিলে শুধু উহার আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিল, আর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কিন্তু একটি বৃক্ষকে দুইখণ্ড করিলে বৃক্ষের আকার ব্যতীত তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রাণবন্ত, সজীব ও জৈব (Organic)। কিন্তু শিলাস্তূপ নির্জ্জীব ও অজৈব (Inorganic)।

সজীব দেহ হইতে কি অন্তর্হিত হইলে দেহের মরণ ঘটে? প্রাণশক্তি কোথায় ছিল, কেমন করিয়া এই পৃথিবীতে আসিল এবং কোথায় যায়,—আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

এককোষময় জীবাধার হইতে বহুকোষময় জীবাধারের সৃষ্টি

এককোষময় জীবাধার হইতে বহুকোষময় জীবাধার গঠিত হইয়াছিল। প্রোটোপ্লাজমের কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত ঘন অংশে ফস্ফরাস (Phosphorus) থাকে। এই ঘন অংশই কেন্দ্রীয়পিণ্ড এবং এই অংশের জন্যই ইহার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কখনও ইহা কেন্দ্রীয় পিণ্ডকোষের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া গিয়া বহুকোষময় আধার গড়িয়া তুলে।
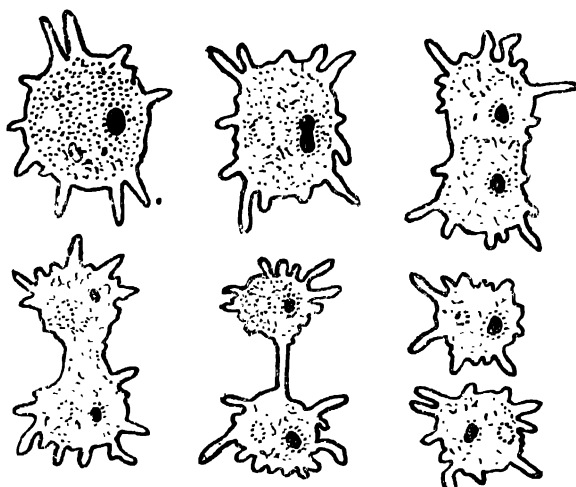
প্রোটোপ্লাজ্‌ম্

অথবা কখনও কেন্দ্রীয় পিণ্ড, বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার কোষও বিভক্ত হইয়া, একাধিক নূতন জীবাধার কোষ গড়িয়া তুলে। প্রথমোক্ত স্থলে বহুকোষময় জ বাধার সৃষ্টির সুযোগ হওয়ায় উহার বৃদ্ধির একটা সুনিশ্চিত উপায় হইল।

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই দেহ কোষময়। উভয়েরই দেহ আদি অবস্থায় এককোষযুক্ত। দৃশ্যতঃ যতই প্রভেদ দেখা যাক না কেন, মূলতঃ উহারা উভয়েই এক। উভয়েই শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করে, ভুক্ত খাদ্য হইতেই নিজদেহ পুষ্ট করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; নিজ নিজ বংশধারা বৃদ্ধি করে এবং যথাকালে উভয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আহার গ্রহণ করিবার রীতি বিভিন্ন।

উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ করিবার বৈশিষ্ট্য

উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বন-দ্বি-অক্সাইদ হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যালোকের প্রভাবে জটীল অঙ্গারজাত উপাদান সৃষ্টি করিয়া, নিজের
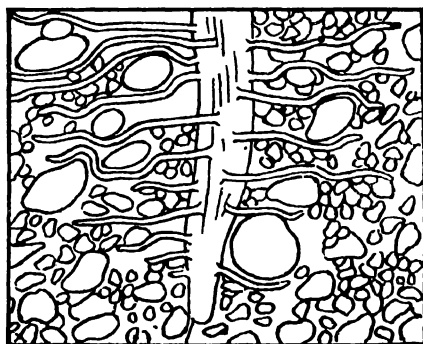
মূলকেশ দিয়া উদ্ভিদের আহার গ্রহণ

তন্তু (Cellulose) গঠন করে। উহাকে মৃত্তিকা হইতে মূলের সাহায্যে নাইট্রোজেন (Nitrogen) গ্রহণ করিতে হয়; এই কারণে উদ্ভিদের আহার্য্য জলে গুলিয়া গ্রহণ করিবার সুযোগ না থাকিলে, খাদ্যাভাবে উদ্ভিদ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। মৃত্তিকায় রস না থাকিলে উদ্ভিদ

আহার গ্রহণ করিতে পারে না। আহার গ্রহণে উদ্ভিদের কিন্তু এক সুবিধা আছে। উহা মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে সাক্ষাৎভাবে অজৈব (Inorganic) অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যালোকের প্রভাবে নিজ-দেহের জৈব (Organic) অংশ গড়িয়া তুলে।

প্রাণীর আহার গ্রহণ করিবার রীতি

প্রাণীরও বাঁচিবার জন্য, বাড়িবার জন্য, অঙ্গার ও নাইট্রোজেন প্রয়োজন। কিন্তু উদ্ভিদের মত তাহা সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিয়া নিজদেহ পুষ্ট করিবার ক্ষমতা প্রাণীর নাই। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত উদ্ভিদদেহরূপ জটীল জৈব খাদ্য-উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রাণী আপন দেহের পুষ্টি সাধন করে। অতএব উদ্ভিদের সৃষ্টি যে প্রাণীর পূর্ব্বেই হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

জীবসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে আহার্য্যের সৃষ্টি

কথায় বলে জীবসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই তাহার আহার্য্য সৃষ্ট হয়। খাদ্যই রূপান্তরিত হইয়া জীবাধার গড়িয়া তুলে। জীবাধার খাদ্যের বিকারমাত্র। মৃত্তিকা, জল ও বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হইবার পর, এমন জীব জন্মিল, যাহা ঐগুলি হইতে সাক্ষাৎভাবে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, সূর্য্যালোকের সাহায্যে জীবাধার পুষ্ট করিতে পারে।

প্রোটোপ্লাজম্ ও ক্লোরোফীল

প্রথমে সূর্য্যালোকপ্রভাবে অল্প উষ্ণ কর্দ্দমে প্রোটোপ্লাজমের জন্ম হইল। উহারই পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সাধনের জন্য, বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত অঙ্গার (Carbon) দ্বারা, দেহ পুষ্ট করিবার প্রয়োজন হইল। তখন এই কাজ করিবার জন্য উক্ত প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ক্লোরোফীলের (Chorophyle) আবির্ভাব ঘটিল।

উদ্ভিদ
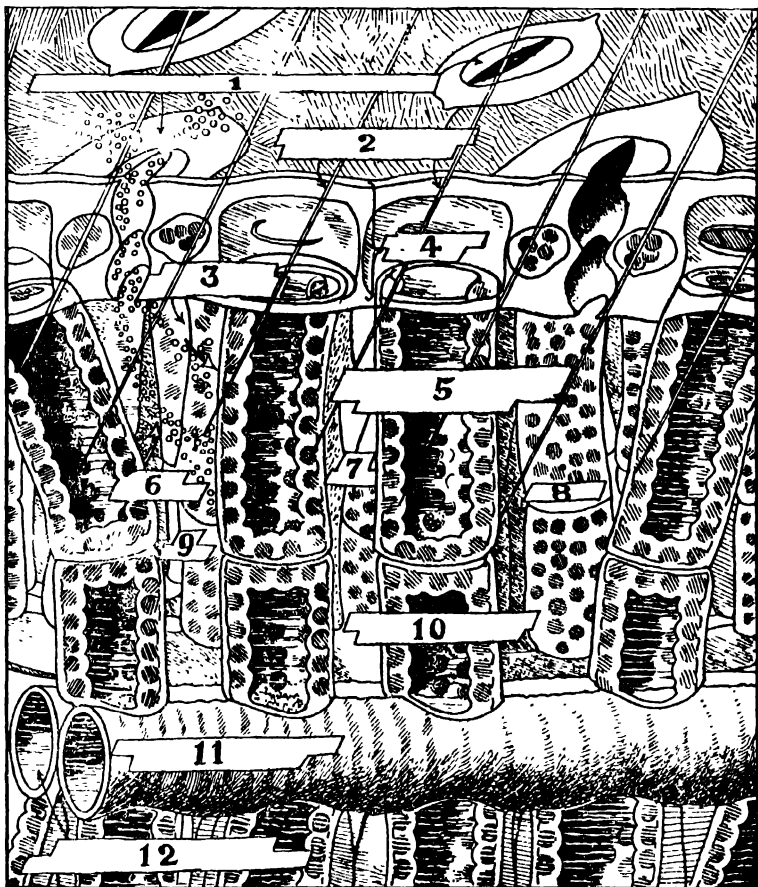
গাছের পাতার অতি-বর্দ্ধিতরূপ। পাতাই গাছের খাদ্যের পাকাশয়। এইস্থানে উহা, অজৈব উপাদানগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সৌরতেজে, ক্লোরোফীলের সাহায্যে পাক করে এবং আপন গ্রহণোপযোগী করিয়া লয়।

(সবুজ কি অবুঝ দ্রষ্টব্য)

উদ্ভিদের যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই ক্লোরোফীল। ইহার সাহায্যে উদ্ভিদ প্রাণীর উপযুক্ত খাদ্য, অঙ্গারজাত জটিল উপাদান, প্রস্তুত করিতে পারে। ক্লোরোফীলের স্বষ্টি না হইলে উদ্ভিদ্‌জগতে প্রোটোপ্লাজমের ক্রমোন্নতি হইত না।

প্রাণী

তাহার পর জল, বায়ু ও উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, এইরূপ স্বষ্টি হওয়ার অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইল। নূতন খাদ্যসমষ্টির বিকারে নূতন জীবাধার গঠিত হইল। এই নূতন জীবাধারে প্রাণ আশ্রয় লওয়ায় প্রাণী জন্মিল।

প্রথমে যখন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হইল, তখন পলি প্রস্তরের (Sedimentary rocks) স্বষ্টি হইতেছিল। প্রথমে প্রাণীর কঙ্কাল ছিল না, সেইজন্য তখনও চূণাপাথর ও খড়িমাটির স্বষ্টি হয় নাই। কঙ্কাল গঠিত না হওয়ায়, ঐ সকল জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পলিপাথরের স্তরে স্তরে প্রোথিত পাওয়া যায় না।

৫

ক্রমবিবর্ত্তনবাদ [Evolution]

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মতে

কুঁড়ি হইতে ফুল ফোটে। কুঁড়ির ভিতরে ফুল সুপ্ত ছিল, কালে কুঁড়ি ফুটিয়া ফুলে পরিণত হইল। এই কুঁড়ির ফুলে পরিণতির পর্য্যায়কে ক্রমবিবর্ত্তন বলে।

প্রাণের আধারের ক্রমবিবর্ত্তনের কথা বহু দার্শনিকের মনে উঠিয়াছিল। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস নানা জীবের দেহ ক্রমশঃ উন্নতি-লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটী মতবাদ প্রচলিত আছে।

প্রথম পক্ষের কথা

প্রথম পক্ষ বলেন, দেহের ক্রমবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক জীবের আদি পুরুষ পৃথক। বর্ত্তমানে অবিভক্ত খুরযুক্ত একশফ অশ্ব অতি প্রাচীনকালে জন্মে নাই। তখন অশ্বের পদতল চারিভাগে বিভক্ত ছিল, ফলে ইহারা তখন চতুঃশফ জীব ছিল। কালক্রমে প্রয়োজনানুসারে উহারা এইরূপ অবিভক্ত পদ লাভ করিয়াছে। আত্মরক্ষার অনুকূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজনানুরূপ পরিণতি প্রত্যেক জীবেরই ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পক্ষের কথা

দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, ক্রমবিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু সকল জীবই একমাত্র আদি প্রাণের আধার প্রোটোপ্লাজমের দেশ ও কালের প্রয়োজনানুরূপ পরিণতি মাত্র।

আদিতে এককোষ প্রোটোপ্লাজম হইতে বহুকোষ প্রোটোপ্লাজম হইল। তারপর প্রাণাধারের ক্রমোন্নতি, নানা জটিল সৃষ্টির মধ্য দিয়া, পুরুষ ও নারীরূপে পরিণতি ঘটিল। তাহার পর উভয়ের মিলনে জীবকুলের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই নূতন জীবন্ত দেহগুলি নানা দেশ ও কালের প্রভাবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া নানা আকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কালে অসংখ্য জটিলতর জীবের সৃষ্টি হইল। মেরুদণ্ডহীন জীব, মৎস্য, সরীসৃপ, উভচর, পক্ষী, স্তন্যপায়ী ও সর্ব্বশেষে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ জন্মিল। এই মতবাদ অনুসারে নূতন নূতন প্রাণী, পুরাতন প্রাণীরই নূতন দেশ ও কালোপযোগী নূতন সংস্করণ মাত্র।

পরে দার্শনিকগণ ভাবিলেন, একমাত্র প্লোটোপ্লাজম হইতে বহু জটিল জীবের সৃষ্টি নাও হইতে পারে। যুগে যুগে সম্পূর্ণ নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হয়ত পুরাতন হইতে হয় নাই। যেমন কোন ঋতুর পর্যায়কালে, ঋতু সমাগমের সমুদায় আভাস একে একে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রতিযুগ-প্রারম্ভে জীবজন্তু ও অন্যান্য সমুদায় পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব লাভ করে।

ইহাই হইল ক্রমবিবর্ত্তন মতবাদগুলির সারার্থ। খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে গ্রীক ও আর্য্যদার্শনিকগণ সৃষ্টির মধ্যে একটী ক্রমবিবর্ত্তনের শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উক্ত মতবাদকে আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতা হইতে মুক্ত করিয়া, ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ চার্ল্স্ ডারউইন্

মানুষ
বনমানুষ
বাঁদর
তিমিমাছ
হাতী
ক্যাঙ্গারু
টেরোডাকটিল
কুমীর
সাপ
কাছিম
বাদুড়
উটপাখী
দন্তহীন পাখী
দন্তী পাখী
খেচর
স্তন্যপায়ী
সরীসৃপ
ডাইনোসর
ফুসফুস-মাছ
কাঁটা-মাছ
মৎস্য
হাঙ্গর
কোলা ব্যাঙ
ব্যাঙ
উভচর
পতঙ্গ
মাকড়সা
বিছা
কাঁকড়া
ভূচর
জোঁক
কেঁচো
ল্যাম্প্রে
টুনিকেট
অষ্টভুজ
শামুক
গুগলী
শুক্তি-জাতীয়
সী আর্চিন
তারামাছ
সী-লিলি
এচিনোডারমস
অরথোপডস
কৃমি জাতীয়
স্পঞ্জ
জেলীমাছ
সামুদ্রিক কীট
প্রবাল
কীট জাতীয়
উদ্ভিদ
এক কোষ-যুক্ত জীব
(প্রোটোজোয়া)
জীব-বৃক্ষ
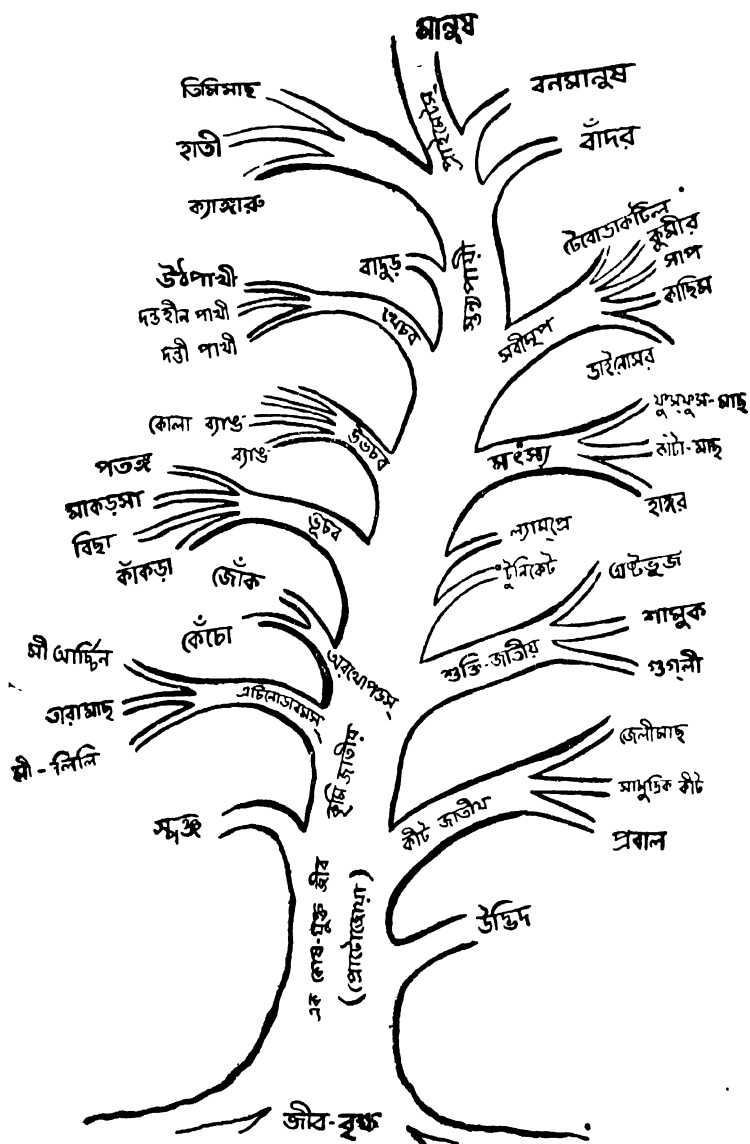
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। "The origin of species" (নানা জীবের জন্মকথা), তাঁহার বিশ বৎসরের কঠোর সাধনার ফল। তাঁহার মতে—

ডারউইনের চারিটী মূল সূত্র

(১) একই জাতির জীব বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। দেশ ও কালের পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে ধারা আহার সংগ্রহ ও শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেইটী বাঁচিয়া যায় এবং উহা হইতে পুনরায় নূতন বংশধারা প্রবাহিত হয়।

(২) এই ভাগ্যবান আদিপুরুষের বৈশিষ্ট্য উহার বংশ ধারায় উৎপন্ন জীবকুল লাভ করে, ফলে উহারাও বাঁচিয়া থাকে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(৩) প্রতি পিতা হইতে পুত্রে, দেশ ও কালের অনুকূল বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে হইতে, কোন এক পুরুষে গিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে।

(৪) এইরূপে কালে পুরাতন বংশধারায় সম্পূর্ণ নূতন জীব সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে দেখা দেয়।

জীবধারায় ক্রমশঃ পর্ব্বে পর্ব্বে দেশ ও কালের অনুকূল নূতন জীবের আত্মপ্রকাশই ক্রমবিবর্ত্তন।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কতক প্রমাণ, পলিপাথরের স্তরে স্তরে সেই সেই যুগের জীবের প্রস্তরীভূত প্রোথিত কঙ্কালবিশেষে, দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পলিপাথরের স্তর জমাট বাঁধিতেছিল, সেই যুগের বৃক্ষ ও বহু কঙ্কালযুক্ত জীবের পরিচয় আমরা ঐ যুগের প্রস্তরীভূত অবশিষ্টে দেখিতে পাই।

আমেরিকার কোলোরাডো প্রদেশের বিখ্যাত, প্রায় এক মাইল গভীর, বিশাল খাড়ির (Grand canyon) স্তরে স্তরে আমরা ঐরূপ বহুজীবের

কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখিতে পাই। কিন্তু কোমলতন্ত্র জীবদেহের কোন পরিচয়ই আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

বর্ত্তমান অশ্বের আত্মবিকাশের চারিপর্ব্ব

ঐস্থানে অশ্বের ক্রমবিবর্ত্তনে চারিটী পর্ব্ব আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীনতম নিদর্শনে দেখি অশ্বের খুর বিস্তৃত ও চারিভাগে বিভক্ত ছিল। অশ্ব তখনও আকারে ক্ষুদ্র ছিল।

দ্বিতীয় যুগের নিদর্শনে দেখি অশ্ব আকারে বাড়িয়াছে, তাহার খুরের বিস্তৃতি কমিয়াছে ও খুরটি তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় যুগের নিদর্শনে দেখি অশ্ব আরো বাড়িয়াছে, খুর দুইটি ভাগে বিভক্ত ও আকারে ক্ষুদ্র হইয়াছে।

তাহার পর চতুর্থ যুগের নিদর্শনে আমরা বর্ত্তমান কালের অশ্বের কঙ্কাল দেখিতে পাই।

খুব সম্ভব প্রাচীনতম অশ্ব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জলাভূমি ছিল। সেই যুগের কর্দ্দমময় জলাভূমি হইতে আহার সংগ্রহ করিতে হইলে হংসের মত বিস্তৃত ও বিভক্ত পদের প্রয়োজন ছিল। তাহার পর জলাভূমি ক্রমশঃ শুষ্কভূমিতে পরিণত হইতে থাকায়, ঐ প্রকার পদ নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। অহেতুক কোন অঙ্গ বহন করা জীবের স্বভাববিরুদ্ধ। সেইজন্য ক্রমশঃ অশ্বের খুরের বিভাগগুলি সংখ্যায় কমিয়া বর্ত্তমান দেশ ও কালের অনুকূল রূপ ধারণ করিয়াছে।

কোন কোন জীবের বিবর্ত্তনশৃঙ্খলের সকল গ্রন্থিগুলিই পাওয়া গিয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কয়েকটী গ্রন্থি এখনও অপূরণীয় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু পলি শিলাস্তূপের স্তরে স্তরে যুগযুগান্তের জীবদেহের যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তহাতেই দৃঢ়ধারণা জন্মে যে জীবধারা ক্রমবিবর্ত্তনের পথেই বর্ত্তমান পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

৬

আর্য্যঋষিদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি*

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় সৃষ্টির স্থূলতত্ত্বই ধরা পড়িয়াছে। এই স্থূলের অন্তরালে সূক্ষ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইলে আর্য্যঋষিদিগের দর্শন প্রয়োজন। জীবের স্থূল বহিরাবরণটুকুই জীবের প্রকৃত পরিচয় নহে, ইহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে সৃষ্টির গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাঙ্গ নিদর্শন মানবদেহ লইয়া বিচার করিলে আমাদের পথ সুগম হইবে।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

বাক্, হস্ত, পাদ, পাকাশয় (মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত) ও জীবধারা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, কর্ম্ম করিবার আশ্রয়বিশেষ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া জীব দ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। চক্ষু বলিতে স্থূল চক্ষুগোলক বুঝিও না। যে সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা স্থূলচক্ষু-গোলক দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ সূক্ষ্মশক্তির কথাই বুঝিতে হইবে।

---

* প্রয়োজন বোধ করিলে শিক্ষক মহাশয় পাঠ্য তালিকা হইতে এই অধ্যায় বাদ দিতে পারেন।

পঞ্চপ্রাণ বা শক্তি

প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান, এই গুলি পঞ্চপ্রাণ। ইহারা শক্তিবিশেষ, নানাকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। যে শক্তিবলে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি বা প্রশ্বাস ত্যাগ করি, উহাকে প্রাণ বলে। যে শক্তির বশে বায়ু দেহের মধ্যে মলমূত্রাদির বেগের মত, দেহমধ্যস্থ পদার্থের অধোগতির সৃষ্টি করে, তাহাকে অপান বায়ু বলে। যে শক্তিবলে দেহস্থ বায়ু আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে ব্যান বলে। সমান শক্তির বশে দেহমধ্যস্থ নাভিবায়ু আহার ও পানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং উদানশক্তির বলে কণ্ঠস্থ বায়ু চক্ষুরাদি উন্মীলন করায়। পঞ্চপ্রাণশক্তির ক্রিয়ার ফলে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূল আধারগুলি কর্ম্ম করিতে পারে। পঞ্চপ্রাণ একই শক্তির, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের, ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার

মন ও বুদ্ধি একই বস্তু। মন চঞ্চল, বুদ্ধি স্থির। কাজ করিবার পর মনের যে পরিণতি হয় উহাই বুদ্ধি। হিসেবী মন হইল বুদ্ধি। মন ও বুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত সংস্কারের আশ্রয়স্থলের নাম চিত্ত। মনের যে অবস্থায়, জীব মনে করে যে সকল কার্য্যই সে নিজের ইচ্ছানুসারে করিতেছে, উহাকে অহঙ্কার বলে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার একই মনের বিভিন্ন অবস্থা।

মন ও জলাশয়। কোন কাজে ঘোলান জল, নীচে দেখা যায় না—এই অবস্থা মন। জল স্থির, নীচে পর্য্যন্ত দেখা যায়—এই অবস্থা বুদ্ধি। থিতান পলি হইল সংস্কার। যেমন পলি ভার অনুযায়ী স্তরে স্তরে সাজান থাকে, ঠিক সেইরূপ সংস্কারগুলি আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী এক এক স্তরে গিয়া সঞ্চিত হয়।

সূক্ষ্মশরীর

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এই ষোলটি

সূক্ষ্মবস্তুর পরিচয় মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। এইগুলি মিলিয়া **জীবের সূক্ষ্মশরীর** গঠিত। এই সূক্ষ্ম শরীর আমাদের **স্থূলশরীরকে** চালায়।

পঞ্চকোষ

রূপান্তরিত খাদ্যের নামই দেহ। **স্থূলশরীর অন্ন হইতে** গঠিত **হয়** বলিয়া উহাকে **অন্নময় কোষ** বলে। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী প্রাণ-শক্তি মিলিয়া **প্রাণময়কোষ হইয়াছে**। পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া **মনোময় কোষ** গঠিত। **পঞ্চ** জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিয়া **বিজ্ঞানময়-কোষ** গঠিত। মানুষের অহঙ্কার, যাহা হইতে মানুষের কর্ত্তৃত্বজ্ঞান জন্মে, তাহাকে **আনন্দময়কোষ** বলে।

কুঁড়ির পাপড়িগুলি যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিলে পুষ্প সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়, ঠিক সেইরূপই এই সূক্ষ্মকোষগুলি নানা আধারে অতি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে হইতে মানুষে আসিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়।

কারণশরীর

এই অহঙ্কারকে কারণ-শরীরও বলে; কারণ জীবভাবের ইহাই প্রথম কারণ। ইহার কারণেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ করে। দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুভূতি এই অহঙ্কারের জন্যই হইয়া থাকে।

পঞ্চকোষের বিকাশের জন্য
পঞ্চশ্রেণীর জীবাধার

জীবভাব বিকাশের প্রথম পর্ব্ব উদ্ভিজ্জ। দ্বিতীয় পর্ব্ব স্বেদজ কীট। তৃতীয় পর্ব্ব অণ্ডজ পক্ষীর আদি জীবাধার। চতুর্থ পর্ব্ব জরায়ুজ পশু এবং সর্ব্বশেষ পর্ব্বে মানবদেহ।

উদ্ভিজ্জ যোনিতে অন্নময় কোষের বিকাশ

জীবমাত্রেই পঞ্চকোষ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে সকল কোষের বিকাশ হয় না। উদ্ভিজ্জ যোনীর মধ্যে মাত্র অন্নময় কোষের বিকাশ দেখা যায়। এই আধারে অন্যান্য কোষগুলি প্রায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রাণময় কোষের সম্পুর্ণ বিকাশ না হওয়ায় উহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে পারে না; ফলে, ইহারা স্থাবর জীব। ইহারা আহার সংগ্রহের জন্য উর্দ্ধে ও ভূমিগর্ভে সঞ্চরণশীল। ইহাদের কেবলমাত্র স্পর্শজ্ঞান হইয়াছে।

স্বেদজ যোনিতে অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ

স্বেদজ কীটাদি যোনিতে অন্নময় ও প্রাণময় দুইটি কোষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, কীটাদি জীব একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে এবং নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা মহামারী আদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রাণকেও ইহা বিপন্ন করিতে পারে। এই অবস্থায় জীবাধার নিজেকে বিভক্ত করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ইহাদিগের মধ্যে প্রাণময় কোষও বিকষিত হইয়াছে, কিন্তু মন জাগে নাই। ফলে আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির প্রেরণায় এই প্রকার জীব পঞ্চপ্রাণের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে পারে না। ইচ্ছার অভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়-গুলি পূর্ণভাবে বিকষিত হইবার সুযোগ পায় না। কেবলমাত্র দেহ আহার গ্রহণ করিতে পারে ও স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে।

অণ্ডজ জীবাধারে অন্নময়; প্রাণময় ও মনোময় কোষের বিকাশ হয়

অণ্ডজ পক্ষী ও সরীসৃপ আদি জীবে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় তিনটীমাত্র কোষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, এই প্রকার জীব চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে এবং ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাবতীয় কার্য্যই করিতে পারে। এই জীবাধারে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বিকষিত হইয়াছে। মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহযোগে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ শক্তিমান। জীবভাবের এই পর্ব্ব হইতে সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য নরনারীর মিলন প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মনের বিকাশ হওয়ায় ইহাদিগের মধ্যে অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়। কাক, কপোত, কুম্ভীর, সর্প ইত্যাদির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে ঐ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না।

জরায়ুজ যোনিতে চারি-কোষের বিকাশ হয়

জরায়ুজ পশুযোনিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় চারিটী কোষের বিকাশ হয়। ইহাদিগের মধ্যে অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ হওয়ায় বুদ্ধির সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জীবাধারে বুদ্ধির বিকাশ হওয়ায় ইহাদিগের বহু কার্য্যে খেয়ালের পরিবর্ত্তে বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃতজ্ঞ কুকুর নিজের জীবন দিয়াও প্রভুর স্বার্থরক্ষা করে। পশুরাজ সিংহ কৃত-উপকার ভুলিয়া যায় না, বরং সময়ে প্রত্যুপকারও করে। বানর, *

অশ্ব ইত্যাদি জরায়ুজ জীবের নানারূপ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধির সাহায্য পাওয়ায় ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে।

মানুষে আনন্দময় কোষের বিকাশ

এইরূপে চারিকোষের ক্রমবিকাশের ফলে জীব সমূহের ক্রমোন্নত বৃত্তিগুলির স্ফুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল যোনিতে আনন্দময় কোষের বিকাশ না হওয়ায় কর্ত্তৃত্বাভিমান্ আসিয়া জুটিতে পারে না। কেবলমাত্র মনুষ্যের মধ্যে পাঁচটী কোষেরই বিকাশ ঘটে। তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান জাগিয়াছে। তখন তাহার হৃদয়ের আনন্দের সুস্পষ্ট প্রকাশ তাহার হাসিতে প্রকাশ পায়। তখন তাহার প্রত্যেক কার্য্যে তাহার কর্ত্তৃত্বের অভিমান ফুটিয়া উঠে। মনুষ্যে আনন্দময় কোষের বিকাশ হওয়ায়, সে কর্ম্মের স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজের অভিমান বশতঃ প্রকৃতির স্বাভাবিক ধারা হইতে মুক্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিগত ব্যষ্টিপ্রকৃতি লাভ করে।

আর্য্যঋষিদিগের মতে সৃষ্টির মুল সূত্র

আর্য্যঋষিদিগের মতে সৃষ্টির মুল সূত্রগুলি এই :—

১। জীবমাত্রেই একাধারে খাদ্য ও খাদক। নানা স্থূল অজৈব (Organic) ও জৈব (In Organic) উপাদান সম্মিলিত হইয়া রূপান্তর লাভ করে। ইহাই জীবাধার বা দেহ। এক জীবাধার অন্য জীবাধারের

আহার্য্য মাত্র। একের মৃত্যু অপরের জন্মের হেতু। বিরাটের আত্ম-বিকাশের ব্যবস্থায় প্রতি সৃষ্টিটি এক একটী পর্ব্ব বিশেষ। একের বিকারে বা রূপান্তরে অন্য দেহের জন্ম হয় বলিয়া এইরূপ সৃষ্টিকে বৈকারিক সৃষ্টি বলে।

২। ভোগের জন্য দেহলাভ, সেই কারণে দেহমাত্রই ভোগায়তন। ভোগের অনুকূল দেহ লাভ হয়।

৩। জীবাধার বা স্থূলদেহ সম্পূর্ণ জীব নহে। দেহ জীবের আত্মবিকাশের আধার মাত্র।

৪। স্থূলদেহকে সূক্ষ্মদেহ চালিত করে।

৫। সূক্ষ্মদেহের মূলে কারণশরীর বা অহঙ্কার।

৬। সূক্ষ্মদেহের ক্রমবিকাশের অনুকূল আধার জীব ক্রমশঃ লাভ করিতে করিতে, মানবদেহ লাভ করিয়া কর্ম্মের স্বাধীনতা লাভ করে।

৭। কর্ম্ম হইতে সংস্কার জন্মে এবং জীবের সংস্কার ভোগের অনুকূল দেহ লাভ হয়।

৮। কর্ম্মানুযায়ী সংস্কার, সংস্কারানুযায়ী দেহ, আবার দেহানুযায়ী কর্ম্ম ; এইরূপ অবিরাম চক্রপথে জীবধারা প্রবাহিত হইতে থাকে।

৭

*সৃষ্টির যুগ বিভাগ

আমাদের পৃথিবীর সূর্য্যগর্ভ হইতে বাহির হইয়া মহাকাশে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবার পর হইতে, প্রথম জীবাধারে প্রাণের উন্মেষ পর্য্যন্ত নিশাকাল; এবং প্রথম প্রাণের উন্মেষ হইতে মানবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কালকে দিবাভাগ বলা চলে। এই দিবাভাগ চারিটি প্রহরে বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রহরের আদি, মধ্য ও অন্ত পর্ব্বে যে সকল জীবাধারে প্রাণের লীলা চলিয়াছিল, তাহার একটা আনুমানিক ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক যুগযুগান্তরের নানা শিলীভূত কঙ্কাল পাইয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

প্রথম প্রহর

প্রাণের লীলায় প্রথম প্রহরের আদি পর্ব্বে, জলে কীটানুকীটের আধারে প্রাণের স্পন্দন প্রথম দেখা দিল।

তাহার পর ঐ যুগের মধ্যপর্ব্বে জলচর কীটগুলি জলে গোলা ক্যালসিয়াম গ্রহণ করিয়া আপনার অতি কোমল দেহের উপর একটা কঠিন আবরণ (shell) গড়িয়া লইল। এই যুগকে ভূতত্ত্ববিদেরা কেম্ব্রিয়ান যুগ (cambrian age) বা কড়ি পর্ব্ব বলেন।

এই যুগের অন্তপর্ব্বে দৃঢ়াবরণ কীট দীর্ঘাকার সামুদ্রিক চিংড়ীতে পরিণতি লাভ করিল। ইহাই হইল ভূতত্ত্ববিদের সিলুরিয়ান (silurian) যুগের কথা। প্রাণের লীলার ইতিহাসে এই যুগকে চিংড়ী পর্ব্ব বলা চলে।

দ্বিতীয় প্রহর

প্রথম প্রহরের অন্তপর্ব্ব শেষে এবং দ্বিতীয় প্রহরের আদি পর্ব্বে দৃঢ়াবরণী জীবাধারে ক্রমশঃ একটা মেরুদণ্ড রূপ লইল। এবং উহার
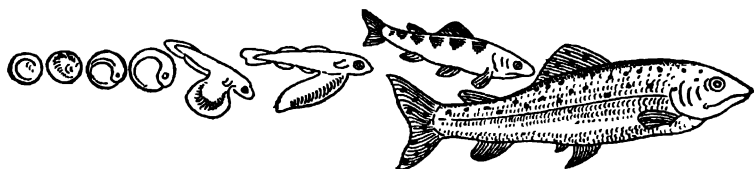
ডিম্ব হইতে মৎস্যের ক্রমবিকাশ।

দৃঢ়াবরণটি কতকগুলি আঁশে পরিণত হওয়ায় মৎস জন্মগ্রহণ করিল। এই যুগ ডিভোনিয়ান্ (Devonian) যুগ বলিয়া খ্যাত।

এই যুগের মধ্য ও অন্ত পর্ব্বে মৎস্য পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া দীর্ঘাকার ও বলশালী হইয়া উঠিল এবং চিংড়ী পর্ব্বের দৃঢ়াবরণ দৈত্যগুলিকে পরাজয় করিয়া মেরুদণ্ডী জীবাধার প্রাণিজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল ।

তৃতীয় প্রহর

দ্বিতীয় প্রহরেব অন্তপর্ব্বে, স্থলে এক নূতন প্রকার জীবাধার দেখা দিল। ইহাবা স্থাবর এবং উর্দ্ধ ও অধঃ দিকে সঞ্চরণশীল। ইহার নাম উদ্ভিদ্।

স্থলের ছায়া-শীতল বনে, তৃতীয় প্রহরের আদি ও মধ্য পর্ব্বে, জলচর জীব ডাঙ্গায় উঠিয়া আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। নূতন প্রাণপূর্ণ বনে আহার্য্য ও নিরাপত্তা দুইই সুলভ হওয়ায় বিপদসঙ্কুল, নির্ম্মম ও অরাজক জলাশয় ত্যাগ করিয়া কতক জীব জল ও স্থল উভয় স্থানেই প্রয়োজনমত আশ্রয় লইতে লাগিল। ইহারাই হইল

উভচর (amphibians)। উভচর মেরুদণ্ডীর হাত ও পা, দুইটি নূতন কর্ম্মেন্দ্রিয় দেখা দিল।

এই কালেই পৃথিবীর নানাস্থানে খনিজ কয়লার স্তর গড়িয়া উঠিল। বৈজ্ঞানিকগণ এই যুগকে কার্ব্বনিফেরস (carboniferrous) যুগ বা অঙ্গার পর্ব্ব বলেন। এই যুগ ত্রিয়াসিক (triassic) বলিয়া পরিচিত।

এই যুগের মধ্য ও অন্ত পর্ব্বে সামুদ্রিক সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটিল।

চতুর্থ প্রহর

তৃতীয় প্রহরের অন্তে ও চতুর্থ প্রহরের আদিতে সরীসৃপ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইল। বিশালকায় ব্রণ্টসরাস (brantosaraus) ও স্টিগোসর স্থলের বনগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করিল। জীব জল ছাড়িয়া প্রথমে স্থলে আশ্রয় লইয়াছিল বাঁচিবার জন্য। কালে সেই জীব স্থলের অধিপতি হইয়া বসিল।

এই সময়েই সরীসৃপের একটি উপধারা পক্ষ লাভ করিয়া আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিল। নিরাপদ আকাশ, নিত্যকলহরত ভীষণদর্শন হিংসাজীবীদিগের হিংসায়, বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। উড়ন্ত ভীষণদর্শন সরীসৃপগুলি, কালে কালে সংস্কৃত হইতে হইতে, বর্ত্তমানের মনোহর পাখীগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। প্রাণীপ্রবাহের এই যুগকে যুরাসিক (jurassic) যুগ বা পক্ষী যুগ বলা হয়।

চতুর্থ প্রহরের আদি ও মধ্যে সমুদ্রগর্ভে খড়ির স্তর গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়েই সরীসৃপের আকার হইল অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর। প্রকৃত পাখীর আদিম সংস্করণের আবির্ভাব এই কালেই ঘটে। এই পাখীগুলির সরীসৃপের মত নখ ও দাঁত জন্মিত। এই যুগেই ওপোসমের (opossum) মত ক্ষুদ্রাকায় স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব ঘটে।

এতদিন পর্য্যন্ত প্রাণাধারের রক্তস্রোত ছিল শীতল; বাহিরের আবহাওয়ার তাপমাত্রানুযায়ী কমিত বা বাড়িত। স্তন্যপায়ীর রক্তস্রোত হইল উষ্ণ, বাহিরের শীততাপে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ঘটিত না। এতদিন প্রাণীপ্রবাহ বজায় থাকিত, মাতৃগর্ভজাত ডিম বাহিরে আসিয়া সৌরতাপে ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে। স্তন্যপায়ীতে এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হইল। মাতৃগর্ভেই ডিম হইতে ছানা ফুটিয়া বাহির হইয়া, মাতৃগর্ভেই কিছুকাল লালিত পালিত হইয়া, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে লাগিল। প্রকৃতিদেবী এতদিন আপনার সৃষ্টিতে, জীবের আত্মরক্ষার জন্য, বর্ম্মের উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। এখন তিনি স্তন্যপায়ী আধারে, বর্ম্ম ছাড়িয়া, অস্ত্র সজ্জায় দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। ফলে নখী শৃঙ্গী, দন্তীগণ সৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করিল।

বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন জীবাধারগুলি হইল দ্রুতগতি। এই ক্ষিপ্র-গতি দিল ক্ষুদ্র অসহায় স্তন্যপায়ীকে, সে অতীত সরীসৃপযুগের ভীষণ দর্শন দৈত্যগণের সর্ব্বগ্রাসী গ্রাস হইতে, পলাইয়া বাঁচিবার উপায়। নখ, দন্ত, শৃঙ্গাদি অস্ত্র দিল তাহাকে আক্রমণে দুর্ব্বারতা ও দুর্দ্ধর্ষতা। এই যুগকে ক্রিটেসিয়াস (cretaceous) যুগ বলে।

এই প্রহরের মধ্য ও অন্তপর্ব্বে ক্ষিপ্রগতি, অস্ত্রসজ্জিত, ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী, প্রতাপে মন্দগতি বর্ম্মাবৃত বিশালকায় সরীসৃপকে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত করিল। তাহার পর সরীসৃপধারার দৈত্যসংস্করণগুলি নানা কারণের সমবায়ে, ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে লোপ পাইল। ফলে স্তন্যপায়ীর বিশাল সংস্করণগুলির আবির্ভাবের সুযোগ ঘটিল। এই যুগকে বৈজ্ঞানিকগণ টারসিয়ারি যুগ (tertiary age) বলেন।

এই যুগের আদিতে দিনোথেরিয়াম (Dinotherium) ও চতুর্দ্দন্ত মাষ্টাডন (Mastadon) বা হাতি দেখা দিল। এই যুগে ষড়শৃঙ্গ

টিনোসেরাস (Tinoseras) বা মহিষ, অসিদন্ত (Sabre-toothed) ব্যাঘ্রের সহিত প্রায়ই রণে মাতিত। এই প্রহর শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে বোধ হয় লেমুর সদৃশ এক প্রাণাধার দেখা দিয়া থাকিবে। এই প্রাণাধার সংস্কৃত হইয়া জন্মিল বানর। এই বানর কালে সংস্কৃত হইয়া লাঙ্গুল ত্যাগ করিলে, মানবের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

প্রতি প্রহরের প্রাণের লীলায় আয়ুষ্কাল কোটি বৎসর ধরিলেও বোধ হয় ভুল করা হয়। আবার প্রতি প্রহরের আদি, মধ্য ও অন্ত পর্ব্বের আয়ুষ্কাল ত্রিশ বা চল্লিশ লক্ষ বৎসর ধরিলেও ভুল হয় না। প্রকৃতি দেবী এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পলে পলে, তিলে তিলে, তাঁহার আধারগুলিতে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। দেশ ও কালের প্রয়োজন বোধে, একটা আদর্শ (model) হয় ত গড়িয়াছেন। আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই, উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, উহার উপাদানে আর একটি নূতন দেশকালোপযোগী আধার গড়িয়া লইয়া; প্রাণের লীলায় গতি অব্যাহত রাখিয়াছেন। তাই ত বাংলার কবিগুরু গাহিয়াছেন—

অপরূপ সে যে
রূপে রূপে—
কী খেলা খেলিছ
চুপে চুপে

৮

উদ্ভিদ সৃষ্টি

উদ্ভিদ সৃষ্টির মুলে ক্লোরোফীল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণী জন্মিবার পূর্ব্বেই উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন একটি মাত্র কোষকে আশ্রয় করিয়া প্রাণের লীলা চলিতেছিল, তখন উহা উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোনটীরই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। যে দিন ক্লোরোফীল উহাকে সবুজ রংএ সাজাইয়া দিল, সেদিন প্রথম উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করিল। সেই আদিউদ্ভিদ হইতে বর্ত্তমান উদ্ভিদ-জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

উদ্ভিদের অতীত জানিবার উপায়

অতীতের উদ্ভিদ-রাজ্যের বিষয় জানিবার প্রথম উপায়, বর্ত্তমানের উদ্ভিদ-জগৎ লক্ষ্য করা। দ্বিতীয় উপায়, পলিপাথরের স্তরে স্তরে অনুসন্ধান করা। এইরূপ উপায়ে উদ্ভিদের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া সম্ভব না হইলেও উহার অতীত ইতিহাসের কতকাংশ জানিতে পারা যায়।

প্রকৃতির ধর্ম্ম দুইটী বিভিন্ন ধারার মিলনে নূতন ধারা সৃষ্টি করা। উদ্ভিদ-জগতে ইহা নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক প্রচেষ্টা হইতে এতপ্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়াছে।

প্রোটোপ্লাজম্

প্রথম উদ্ভিদকে প্লোটোপ্লাজম্ বলে। ইহা একটীমাত্র কোষ, ঘন কেন্দ্র-পিণ্ড ও ক্লোরোফীলে গঠিত। ইহার জন্ম জলে। এইরূপ

আদি উদ্ভিদ

প্রত্যেক উদ্ভিদকোষটী ফাটিয়া গিয়া চারিটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। ইহারা পুরাতন কোষের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজেদের স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

জীবনের তিনটি লক্ষণ

জীবন্ত পদার্থমাত্রেরই জীবনের পরিচয় তিনটী লক্ষণে পাই :

(১) আকার বৃদ্ধি।

(২) আকারে ও গঠনে অধিকতর জটিল রূপ ধারণ।

(৩) প্রত্যেকটী বিষয়ে বৈচিত্র্যবৃদ্ধি।

জীবের আকার বৃদ্ধির সীমা

প্রথম লক্ষণ অনুসারে উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোন সীমা নাই ; উহা আকারে অসম্ভব বাড়িতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক ঝড়ঝাপটা, উহার নিজের ভার ইত্যাদি নানা কারণে উদ্ভিদ বাড়িতে বাড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রাণীর ক্ষেত্রে উহার আকার বৃদ্ধির এক প্রধান অন্তরায় তাহার নির্দ্দিষ্ট কাঠাম বা কঙ্কাল। তবে যেস্থলে উদ্ভিদকে নিজের ভার বহন করিতে হয় না বা ঝড়ঝাপটা হইতে বাঁচিবার কোন উপায় থাকে, সেস্থানে উদ্ভিদের আকার বৃদ্ধির কোন সীমা নাই। লতা, সামুদ্রিকদল, বেতগাছ ইত্যাদির ক্ষেত্রে, আকার বৃদ্ধির কোন সীমা নাই। ইহারা বাড়িতে বাড়িতে আকারে অতি দীর্ঘ হইতে পারে। কোন কোন বৃক্ষকেও খুব বাড়িতে দেখা যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার লোহাকাঠের (Red wood) গাছ, অষ্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ্টাস্ দৈর্ঘে তিন চারিশত ফুট পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা যায়। উহার বেড় এত বিস্তৃত যে, গাছের গুঁড়িতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ বৃক্ষও বিরল নহে। ঐরূপ বৃক্ষের বয়স হিসাব করিলে দেখা যায়, কোনটীর বয়স দুই হাজার বৎসরেরও অধিক। সামুদ্রিকদলের ভার জল বহন করে, ঝড়ের কোন বালাই নাই, সেই জন্য উহা বাড়িতে বাড়িতে সমুদ্রের বিস্তৃত স্থান অধিকার করে। সারগাসো সমুদ্র এইরূপ সামুদ্রিক দলের সৃষ্টি।

সরল হইতে জটিল রূপ সৃষ্টি

সৃষ্টির আদিতে সরলরূপ, উত্তরকালে উহাই জটিলরূপ ধারণ করে। আকার ও গঠনের সরলতা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, য়্যাল্‌গী (Alage) বা জলজ শ্যাওলা প্রথমে জন্মিয়াছিল। ইহার পাতার বা ডাঁটার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা আগাগোড়া কতকগুলি সরল কোষের সমষ্টিমাত্র। দেখিলে মনে হয় কতকগুলি সরল কোষ মিলিয়া একটি জীবাধার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। ইহা দেখিতে সবুজ, ধুসর বা রক্তবর্ণ হয়। সামুদ্রিক য়্যাল্‌গী জলের মাথা হইতে প্রায় এক বা দেড়শত ফুট নিম্নে ভাসে। ফলে সূর্য্যালোক জলের নীচে যতটুকু পৌছিতে পারে সেই অনুপাতে উহার বর্ণের তারতম্য ঘটে।

উত্তর মেরু
উত্তর মেরু সাগর
গ্রীনল্যাণ্ড
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস
উপসাগর স্রোত
ইয়োরোপ
আফ্রিকা
মহাসাগর
দক্ষিণ আমেরিকা

সারগাসো-সমুদ্র

সারগাসো সমুদ্রে

শ্যাওলার আকারের কিছু স্থিরতা নাই, অতি ক্ষুদ্রও হইতে পারে, আবার অতি বৃহৎও হয়। পুষ্করিণীর জলে যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়, ঐরূপ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র শ্যাওলা উহার কারণ। পূর্ব্বোক্ত সারগাসো সমুদ্রে, ৪০,০০০ বর্গ মাইল, এইরূপ অতি বৃহৎ শ্যাওলার ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতে এইরূপ বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সামুদ্রিক শ্যাওলার কোন কোন ঘন বন হইতে, কালো পাথুরে কয়লার স্তর যে গড়িয়া উঠে নাই, একথা কে বলিতে পারে? প্রাচীনতম পলিপাথরের স্তরে যে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সকল-গুলিই ঐরূপ শ্যাওলাবিশেষ।

জলে শ্যাওলা ও স্থলে 'ছ্যাতা' (Fungi) একই উদ্ভিদের বিভিন্নরূপ। কিন্তু 'ছ্যাতাগুলিতে উদ্ভিদের মত ক্লোরোফীল নাই। উহারা সাক্ষাৎভাবে সরল প্রাকৃতিক উপাদান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। উহারা উদ্ভিদরূপ জটিল প্রস্তুত খাদ্যই গ্রহণ করে।

বৃক্ষ, পর্ব্বত, বা শিলাগাত্রে যে 'ছ্যাতা' পড়িতে দেখা যায়, উহাও ঐরূপ একপ্রকার জীবাধার। ঐরূপ ক্ষেত্রে একটী 'ছ্যাতাকে' একটী ক্ষুদ্র শ্যাওলার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক অঙ্গ শ্যাওলা, অপর অঙ্গ ছ্যাতা। শ্যাওলা অংশে সবুজ রং জন্মায় ও প্রাকৃতিক উপাদান খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। মাতার গর্ভে সন্তান যেরূপ মাতার ভুক্ত অন্নরসে বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ 'ছ্যাতা' শ্যাওলার ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া বাঁচে।

পাথুরে কয়লার জন্ম

প্রাণের লীলা শ্যাওলা, 'ছ্যাতা' ও শ্যাওলা-ছ্যাতা মিলিত জীবাধারে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহার পর ক্রমশঃ উদ্ভিদ জটিলতররূপ

ধারণ করিতে লাগিলে শিলাস্তরে কয়লা সৃষ্টির উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইল।

যখন অল্পায়ু ও দ্রুতবৃদ্ধি বৃহদাকার উদ্ভিদ জন্মিতে লাগিল, তখন চারিদিকে জলাভূমি। পৃথিবীর সমতল ভূমিতে বৃষ্টির জল পড়িয়া বদ্ধ জলাভূমির সৃষ্টি করিত। এই সকল জলায় কেবলমাত্র জন্মিত একপ্রকার কোমল উদ্ভিদ ; তাহারা যত শীঘ্র জন্মিত, ততোধিক শীঘ্রই ঝরিয়া পড়িত। প্রতি বৎসরে এই গাছগুলি হইতে পাতা ঝরিয়া, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, সেই জলায় জমা হইত। আবার নূতন গাছ জন্মিত, দ্রুত বাড়িত, নূতন বনের সৃষ্টি করিত। এইরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া ঝরাপাতা ও ভাঙ্গাগাছ জড় হইয়া পচিয়া ক্রমশঃ একটী কৃষ্ণবর্ণ স্তর গড়িয়া তুলিত। অদ্যাবধি এইরূপ স্তর পৃথিবীর বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দেশের অধিবাসীরা এই স্তর কাটিয়া লইয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে।

তাহার পর কালে এইরূপ স্তর, ভূমিকম্পে বা কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে, মাটি চাপা পড়িল। আবার এই মৃত্তিকা স্তরের উপর বৃষ্টি পড়িয়া জলার সৃষ্টি হইল, আবার পূর্ব্বের মত গাছ জন্মিল। তাহাদের ঝরাপাতা ও ভাঙ্গাডাল স্তূপীকৃত হইয়া অপর এক নূতন স্তর গড়িয়া তুলিল। এইরূপে যুগে যুগে হয়ত ভূমিকম্পের মত কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে মাটি, বালি, পাথর চাপা পড়িয়া নূতন নূতন স্তরের সৃষ্টি করিল। নূতন স্তরগুলির চাপে নীচেকার মৃত উদ্ভিদ স্তরগুলি এক রসহীন কঠিন উপাদানের স্তরে পরিণত হইল। বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কৃষ্ণবর্ণ মৃত উদ্ভিদের এই স্তরগুলিকে আমরা আজকাল পাথুরে কয়লা বলি।

১

প্রাণীসৃষ্টি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রোটোপ্লাজম্ হইতে প্রথমে যে জীব জন্মিল উহাতে প্রাণের স্পন্দন থাকিলেও, উহাকে উদ্ভিদ বা প্রাণী কিছুই বলা চলে না। ক্রমশঃ উহাদিগের মধ্যে কতকগুলিতে ক্লোরোফীল নামক সবুজ রং জন্মিতে লাগিল। এই রং পাওয়ায় ঐ জীবাধারগুলি সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। এইরূপে সবুজ জীবগুলি উদ্ভিদে পরিণত হইল।

তাহার পর যে জীবগুলিতে ক্লোরোফীল জন্মিল না, উহারা সাক্ষাৎভাবে প্রাকৃতিক উপাদান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া, উদ্ভিদ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট হইতে লাগিল। ইহাই হইল প্রথম প্রাণী।

প্রোটো-কোকস্ ও প্রোটোজোয়া

ক্লোরোফীলের জন্য জীবকুল, উদ্ভিদ ও প্রাণীরূপ, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রোটোপ্লাজম্ হইতে ক্লোরোফীলের জন্য যে প্রাথমিক উদ্ভিদগুলি জন্মিল, উহারা প্রোটো-কোকস্ (Proto-cocos) নামে পরিচিত। ক্লোরোফীল-হীন যে প্রথম প্রাণী জন্মিল তাহার নাম প্রোটোজোয়া (Proto-zoa)।

প্রোটোপ্লাজম্ + ক্লোরোফীল = প্রোটোকোকস্ (আদি-উদ্ভিদ)

প্রোটো-প্লাজম্ — ক্লোরোফীল = প্রোটোজোয়া (আদি-প্রাণী)

প্রথম প্রাণীর জন্ম জলে

উত্তরকালে ঐ প্রাণীগুলির দেহের গঠনে ক্রমশঃ জটিলতা দেখা দিল। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কতকগুলি ধারা নির্দ্দিষ্ট কঙ্কালরূপ লইল। উদ্ভিদের মত প্রথম প্রাণী জলেই জন্মিয়াছিল। ফলে ইহারা প্রাণত্যাগ করিলে ইহাদের কঙ্কাল সমুদ্রগর্ভে গিয়া জড় হইতে লাগিল। ঐগুলি কালে পলিপাথরের স্তরে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আজিও ইহাদিগের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

ক্যালসিয়াম্ গঠিত কঠিন বহিরাবরণের জন্য প্রাণীর আকার হইল নির্দ্দিষ্ট

প্রোটোজোয়ার বহিরাবরণ ক্যালসিয়াম্ (Calcium) নামক মৌলিক পদার্থ (element) সংগ্রহ করিয়া কঠিন হওয়ায় ঝিনুক, গুগলি
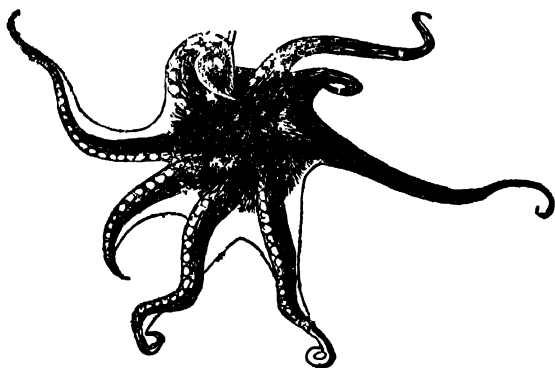
অষ্টভুজ

শামুক ইত্যাদি জীবের সৃষ্টি হয়। এইরূপ কঠিন বহিরাবরণ গঠিত হওয়ায় ঐরূপ স্থলে জীবের আকার হইল নির্দ্দিষ্ট এবং উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল।

কঠিন বহিরাবরণহীন জীব তাহার দেহের আকার বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইচ্ছা বা প্রয়োজনের অনুরোধে, প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে। অষ্টভুজ (octopus) তাহার ভুজগুলি এই কারণেই অতি সহজে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে।

তন্তু-গঠন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেন্দ্রস্থিত ঘনপিণ্ড একাধিক অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন না করিয়া যখন একত্রে জীবন যাপন করে, তখন হইতেই এককোষ হইতে বহু কোষময় দেহাংশ সৃষ্টি হয়। এই বহু-কোষময় দেহাংশকে তন্তু বলে। পর্ব্বে পর্ব্বে প্রাণী যতই উন্নত হইতে লাগিল, তাহার দেহের গঠনে ততই জটিলতা দেখা দিল। তখন হইতে তাহার প্রত্যেক তন্তুটি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হইতে লাগিল।

উন্নত জীবে সকল তন্তুগুলিই একরূপ হয় না। প্রতি তন্তুই প্রোটোপ্লাজমে গঠিত হইলেও, প্রতি তন্তুটির কার্য্য অনুসারে তাহার রূপ পৃথক হয়। এইরূপে বিভিন্ন কার্য্য সাধনের জন্য উন্নত জীবকুলে ক্রমশঃ ত্বক, স্নায়ু, মাংসপেশী ও অস্থি দেখা দিল। এইগুলি বিভিন্ন প্রয়োজন, সিদ্ধির জন্য একই তন্তুর বিভিন্ন রূপধারণ মাত্র।

ঝড়, দেহভার ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক না থাকিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোন সীমা থাকিত না। কিন্তু প্রাণীর সম্বন্ধে একথা খাটে না। উহার দেহ একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত। ঐ পরিকল্পনার স্বাক্ষ্য উহার কঙ্কাল। সেইজন্য কোন প্রাণী তাহার কঙ্কালের অতিরিক্ত কোন দিকেই বাড়িতে পারে না। ফলে প্রাণী মাত্রই কতকগুলি

নির্দ্দিষ্ট পথে বাড়িয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্যই দুইতিন হাজার বৎসরের গাছও অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রাণীই ইহার এক চতুর্থাংশ আয়ুও পায় না।

প্রাণীর পাঁচটী স্বাভাবিক শ্রেণী

প্রাণীদিগের কঙ্কাল লক্ষ্য করিলে মনে হয় উহাদিগকে পাঁচটী সুস্পষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম মেরুদণ্ডহীন; দ্বিতীয় মেরুদণ্ডী; তৃতীয় মস্তিষ্কহীন মেরুদণ্ডী; চতুর্থ মস্তিষ্কযুক্ত মেরুদণ্ডী।

পঞ্চম উভচর (জলচর ও স্থলচর বা খেচর)—সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী এবং সর্ব্বশেষে মানুষ। পলিপাথরের স্তরে স্তরে যে কঙ্কালগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি বিচার করিলেও আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হই।

জীব সৃষ্টির প্রথম যুগে জীবের জলে আশ্রয়

বৈজ্ঞানিকদিগের মতে পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিবর্ত্তন পাঁচটী যুগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম যুগে জীবের জলে আশ্রয়। জলজ উদ্ভিদ, মেরুদণ্ডহীন ও মস্তিষ্কহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত।

'নার' মানে জল। বিরাট পুরুষ সেই নারকে আপনার অয়ন বা আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল নারায়ণ।

প্রথমে পৃথিবী জলময় ছিল, সেইজন্য জলেই প্রথম জীবাধারে প্রাণ জাগিয়াছিল। জলচর জীবের প্রতিনিধি মীন। সেইজন্যই ভক্তকবি

গাহিয়াছেন,

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীনশরীর—
জয় জগদীশ হরে ॥

জীব সৃষ্টির দ্বিতীয় যুগে উভচর

দ্বিতীয় যুগে পাথুরে কয়লা জমাট বাঁধিয়াছে। পৃথিবীতে তখন উভচর জীব দেখা দিয়াছে। এ যুগের প্রতিনিধি কচ্ছপ সেইজন্য
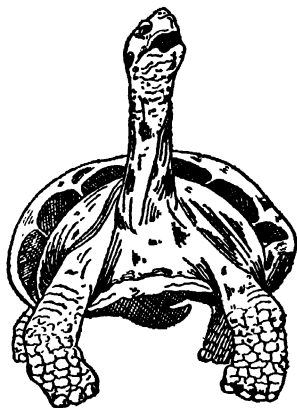
ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণ চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

এ যুগের শেষার্দ্ধে স্থলচর জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবসৃষ্টির তৃতীয় যুগে পক্ষীর জন্ম

তৃতীয় যুগে সরীসৃপ প্রধান জীব। বর্ত্তমান যুগের টিকৃটিকি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশালদেহ ভীষণগর্জ্জন অধুনালুপ্ত ব্রণ্টসরাস (Brontosurus) প্রভৃতি নানা আকারের জীব দেখিতে পাওয়া যাইত। এই যুগেই প্রথম পক্ষীর পরিচয় পাই এবং স্তন্যপায়ী জীবও এই কালেই প্রথম দেখা দেয়। এই যুগের শেষে খড়িমাটীর স্তর জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চতুর্থযুগে স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য

চতুর্থ যুগে স্তন্যপায়ী জীব প্রাধান্য লাভ করে উদ্ভিদ জগতে তখন ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।
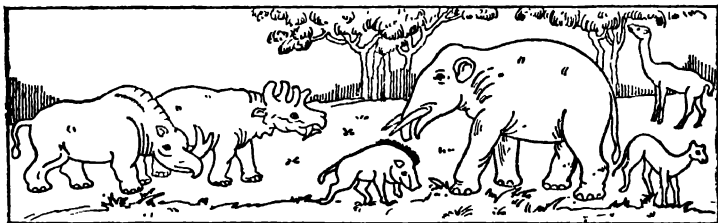
এই যুগেই

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত শূকররূপ,
জয় জগদীশ হরে॥

পঞ্চম যুগে মানুষের আধিপত্য

পঞ্চম যুগে মানুষ পৃথিবীতে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে মানুষ কৃষিকার্য্য আবিষ্কার করায় উদ্ভিদজগৎ এ যুগে তাহার করতলগত।

স্পঞ্জ

বহুকোষ-প্রাণীর মধ্যে স্পঞ্জ নিম্নতম শ্রেণীর জীব। ইহারা লবণাক্ত জলে জন্মে ও বাস করে। ইহাদের মস্তক নাই। সেইজন্য ইহাদিগের

বাম বা দক্ষিণ-পার্শ্ববোধ নাই। ইহাদিগকে কোন কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় (Organs of sense) হয় নাই এবং ইহারা স্থান হইতে
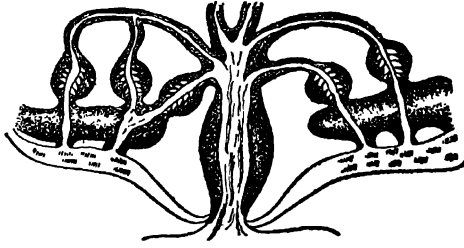
স্পঞ্জ

স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম। উহার দেহে যে অসংখ্য ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি খাদ্য পরিপাক করিবার পাত্র মাত্র।

জেলিমৎস্য ও প্রবালকীট

তাহার পরের স্তরেই জেলিমৎস্য ও প্রবালকীট। ইহারা প্রায় স্পঞ্জের মতই দেখিতে গোলাকার, তবে প্রভেদ এই, ইহাদিগের আহার্য্য পরিপাক করিবার মাত্র একটি আধার দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কোন কোন জীবের মধ্যে কোন কোন ইন্দ্রিয়েরও উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরের গোষ্ঠীর জীবগুলির আকৃতিও গোলাকার। ইহাদের মস্তক তখনও রূপ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু দেহের গঠন জটিলতর

জেলিমৎস্যের ক্রমবিকাশ

হইয়াছে। ইহাদিগের দেহে স্নায়ুমণ্ডলী, রক্তাধার ও খাদ্যপরিপাকের ব্যবস্থা বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত জীবাধারে কেবল মাত্র অন্নময় কোষের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কের প্রথম পরিচয়

ইহার পরের শ্রেণীভুক্ত জীবগুলিতে মস্তক আকার লইয়াছে। বোধ হয়, মস্তিষ্কের পৃথক সত্তার এই প্রথম পরিচয়। ইহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়াছে। ইহার ফলে ইহাদিগকে গমনাগমনের সুবিধা হইল। এই শ্রেণীর জীব মাথা তুলিয়া সম্মুখ দিকে চলিতে ফিরিতে পারে। ইহাদিগের বাম ও দক্ষিণপার্শ্ববোধ হইয়াছে। কেঁচো, কৃমি ও জোঁক এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারাই প্রথম স্থলে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রাণময় ও অন্নময় উভয় কোষেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।
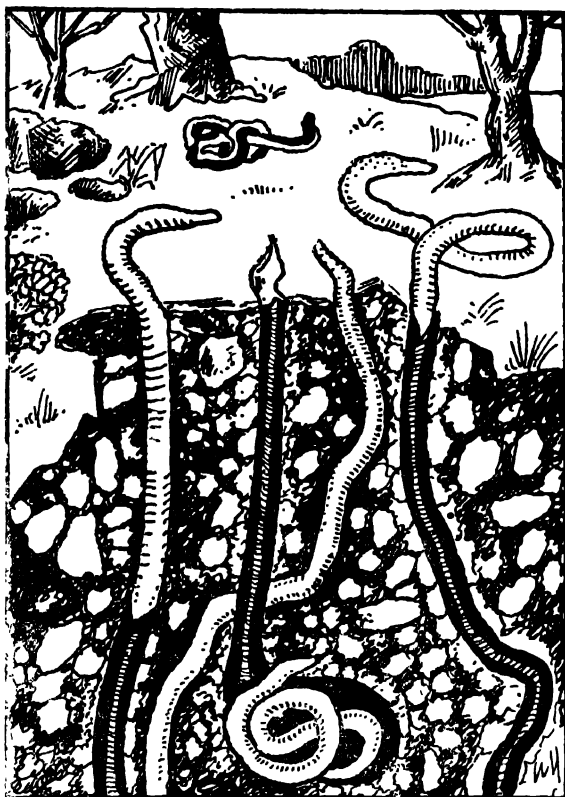
কেঁচোর বাসায় কেঁচো

বহুপদী জীবের সৃষ্টি

তাহার পর পোকা, মাকড়, বিছাজাতীয় বহুপদী জীব, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ী, শামুক ইত্যাদির ক্রমশঃ আবির্ভাব ঘটিল। ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকতর কার্য্যকর হওয়ায় ইহাদিগের চলাফেরার ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। সম্মুখের কতকগুলি অঙ্গ আহার্য্য ধরিয়া মুখে পুরিবার

ও কাটিয়া খাইবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহাদিগের মধ্যে আবার বহুপদীজীবের সম্মুখের কতকগুলি অঙ্গ হস্ত, পদ ও চোয়ালের আকার ধারণ কবিল। এইরূপেই কোন প্রকারে হয়ত জলজ প্রাণীর
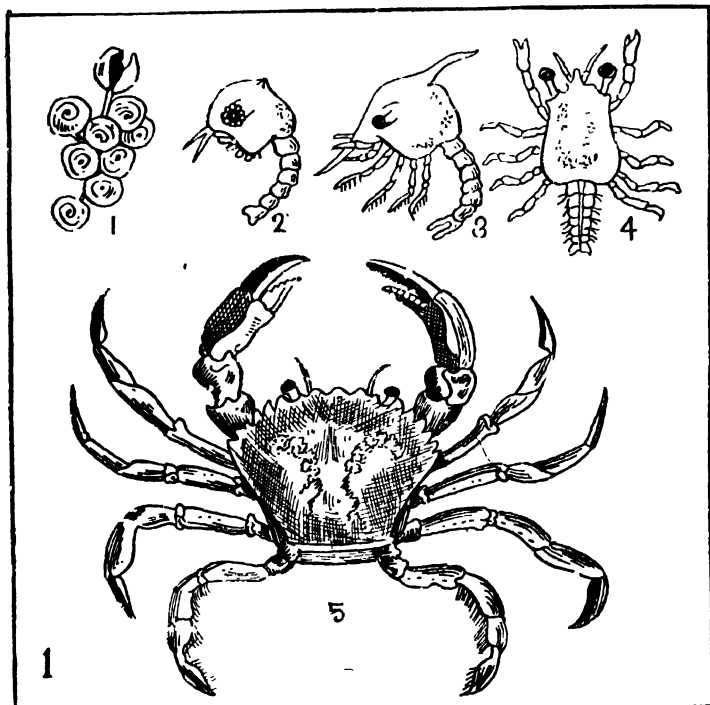
ডিম্ব হইতে কাঁকড়াব ক্রমবিকাশ

জলে নিঃশ্বাস লইবার সুবিধার জন্য, 'কান্‌কো' রূপ লইল, এবং স্থলচরের ফুস্‌ফুস্‌ জন্মিল। ক্রমশঃ জীব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল এবং উহার দেহে শুঙ দেখা দিল।

শুক্তি প্রভৃতির মত আর একদল জীবের দেহের গঠনে বিশেষ উন্নতি দেখা দিল। ইহাদিগের দেহে মস্তিষ্ক, মুখ, পাকাশয়, স্নায়ুমণ্ডলী, রক্তাধার হৃৎপিণ্ড ও কর্ণকূপ (কানকো) আকার লইল। অষ্টভুজের মত জলজ জীবের, ও মাকড়সার মত স্থলচরের, ভুজের সাহায্যে চলিবার ও আহার্য্য ধরিবার বিশেষ সুবিধা হইল এবং ইহাদিগের বেশ কার্য্যকর চক্ষু ফুটিল।

এইরূপে ক্রমশঃ মেরুদণ্ডহীন জঙ্গম জীবের পূর্ণ বিকাশ ঘটিল। এতদিনে জীবাধারে অন্নময় কোষের সহিত প্রাণময় কোষের পূর্ণ সহযোগ দেখা দিল।

১০

মৎস্য, সরীসৃপ ও খেচর

কোমলদেহ আদি-মৎস্য যুগ

আদি-মৎস্যের দেহ খুব সম্ভব অতি কোমল ছিল। সেইজন্য তাহার কোন চিহ্ন শিলাস্তরে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মস্তিষ্কহীন মেরুদণ্ডী জীবাধারে প্রথম মৎস্যের আবির্ভাব। তাহার পর ক্রমশঃ মাকড়সা, উভচর সরীসৃপ আদির মত নিম্ন শ্রেণীর জীবকুল যখন জল হইতে স্থলে উঠিয়া বাসা বাঁধিতেছিল, তখনও স্থলচর জীব জলচরের উন্নত দেহ লাভ করে নাই। সে যুগে স্থলচরের মধ্যে সরীসৃপই প্রধান এবং উদ্ভিদ জগতে ফার্ণ্ই (Fern) ছিল শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

কঠিন আঁসযুক্ত মৎস-যুগ
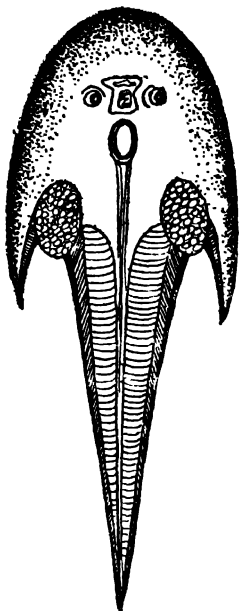
প্রস্তরীভূত মৎস্য

সে-যুগের মৎস্যের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিলে মনে হয় উহার দেহ ও মস্তকে অস্থিময় কঠিন আঁস ছিল। বর্ত্তমান যুগের কুকুরমৎস্য (dog-fish) ও হাঙ্গরের কঙ্কাল পরীক্ষা করিলে মনে হয়, ইহাদিগের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ সে-যুগেও বর্ত্তমান ছিল। হাঙ্গরের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত ফুট পর্যন্ত হইত। ক্রমে খড়ি-মাটীর যুগে, বর্ত্তমান কালের মৎস্যের মত কোমল আঁসযুক্ত মৎস্য, উন্নত শ্রেণীর কীটপতঙ্গাদি ও বৃক্ষে পুষ্প দেখা দিল।

প্রথম উভচর

সে যুগের বিশাল জলায় বাসের অনুকূল দেহের গঠন কতক জীব লাভ করায় তাহারা উভচরে পরিণত হইল। ইহারা শৈশবে জলচরের উপযোগী 'কানকুয়া' দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিত এবং যৌবনে স্থলচরের উপযোগী ফুসফুস সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করিত। আশ্রয় স্থলের অনুকূল শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটায় মূক জলচর মৎস্য উভচরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভ করিয়া চঞ্চল জিহ্বা ও শব্দ করিবার যন্ত্রলাভ

করিল। শৈশবে জলচরের ডানা, যৌবনে উভচরের অগ্র ও পশ্চাৎ পদে পরিণত হইল। এই উভচরগুলি আধুনিক যুগের বেঙ ইত্যাদির পুর্ব্ব-পুরুষ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুজাতীয় উভচরের

ডিম্ব হইতে বেঙের পরিণতি

আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এইপ্রকার উভচর জীব হইতেই উত্তরকালে বিশালদেহ সরীসৃপ জন্মে।

উভচর হইতে সরীসৃপ ও খেচর জন্মিল

উভচর জীব একেবারে জলের সম্পর্ক ত্যাগ করে না। কিন্তু ঐ বিশালদেহ সরীসৃপ ক্রমশঃ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে স্থলচরের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করিল। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি প্রতিকূল আবেষ্টনীর ভিতর আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতগতি লাভ করিল। উহাদিগের

মধ্য হইতেই কতকগুলি, আবার দ্রুতগতিদেহের অনুকূল উড়িবার পক্ষ পাওয়ায়, আকাশে চলিবার ফিরিবার উপায় লাভ করিল। খেচর জীবের মধ্যে কতকগুলি আকাশে আহারের অভাবে পুনরায় জলে ফিরিয়া
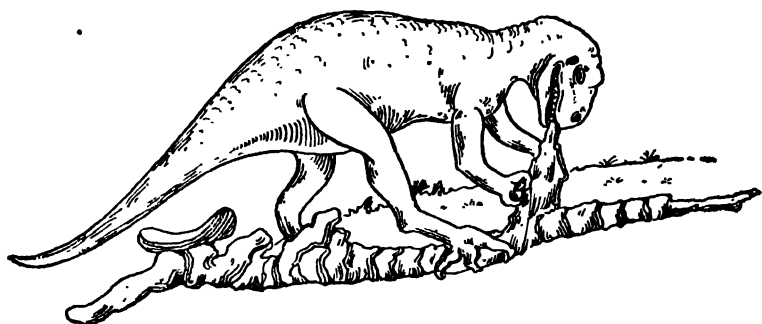
আমিষভোজী সরীসৃপ
ইহারা দৈর্ঘে প্রায় ত্রিশ ফুট হইত।

গেল। জলচরের ডানা হইতে উভচরের পদের সৃষ্টি হইয়াছিল, পুনরায় ঐগুলি জলে ফিরিয়া আসায় পদগুলি জলে গতির অনুকূল ডানায় পরিণত হইল। প্রাপ্ত আহার্য্যের তারতম্যে ইহাদিগের মধ্যে কেহ **আমিষভোজীর** দন্ত এবং কেহ বা **উদ্ভিদভোজীর** দন্ত লাভ করিল।

থেরোমর্ফ্‌স্‌ প্রাচীনতম সরীসৃপ

বৈজ্ঞানিক প্রাচীনতম সরীসৃপের নাম দিয়াছেন থেরোমর্ফ্‌স্‌ (Theromorphs)। উহা আপন প্রকাণ্ড দেহ ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে পারিত। ইহাদিগের মধ্যে কোন জাতির মস্তক

বৃহৎ হইতে, আবার কোন জাতির বৃহৎ দন্ত হইত। ইহাদিগের প্রায় আটফুট উচ্চ প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

ইগুয়ানডন্ (Iguanodon)

উদ্ভিদ্‌ভোজী সরীসৃপ ; ইহারা স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রায় দশ ফুট হইত

ডাইনোসর

থেরোমর্ফস্ হইতে ডাইনোসর (Dinosaur) জন্মিল। অন্যান্য সরীসৃপের মত ইহারাও বহুপ্রকারের হইত। কেহ দন্তী, কেহ শৃঙ্গী, কেহ নিরামিষভোজী, আবার কেহ বা আমিষভোজী। বর্ত্তমান যুগের

গণ্ডার, হস্তী, ক্যাঙ্গারু ও পক্ষীর সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকারে কোনটীর দেহ হইত এই যুগের হস্তীর মত, কিন্তু দৈর্ঘ্যে হইত প্রায় চল্লিশ হাত; আবার পক্ষীর মত মাত্র এক ফুট দীর্ঘ ডাইনোসারও বিরল ছিল না।

হংসমুখী ডাইনোসার; ইহারা জলায় বাস করিত

প্লেসিওসর্ ও ইচ্‌থাইওসর্

ইহাদিগের মধ্যে প্লেসিওসর্ ও ইচ্‌থাইওসর্ স্থলচরের উপযোগী অঙ্গ প্রতঙ্গ লাভ করিয়াও খাদ্যাভাবে জলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে, তাহারা সন্তরণকালে পদগুলি দাঁড়ের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ ইহারা মৎস্যভোজী ছিল।

জলে গিয়া প্লেসিওসর্ দেখিতে হইল অনেকাংশে রাজহংসের মত। গ্রীবা হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ইহাদিগের দৈর্ঘ্য হইত প্রায় ১৫ হাত। ইচ্‌থাইওসর্সের হইত শুশুকের (Porpoise) মত মাথাটী বড় ও গ্রীবাদেশ ক্ষুদ্র। টেরাড্যাক্‌টাইল, সরীসৃপ হইলেও, উড়িতে পারিত। উহাদিগের পক্ষগুলি হইল বর্ত্তমান যুগের বাদুড়ের মত, আর আকারও হইল ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকারের।

এই যুগে সরীসৃপ জল, স্থল ও আকাশে, সকল স্থানেই প্রাধান্য লাভ করে। আকারে ও জাতিভেদে স্তন্যপায়ীর সহিত সরীসৃপের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সরীসৃপ হইতেই স্তন্যপায়ী জন্মে।

প্রথম স্তন্যপায়ী

পলিপাথরের যে যুগের স্তরে প্রথম স্তন্যপায়ীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া যায়, সে যুগে বিশাল দেহ সরীসৃপই ছিল প্রধান জীব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরীসৃপের আকারের তুলনায় সে যুগের স্তন্যপায়ী অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হইলেও, সরীসৃপ স্তন্যপায়ীর বিলোপ সাধন করিতে পারে নাই, বরং স্তন্যপায়ীর বংশধারা আজ পৃথিবীব্যাপী। সরীসৃপজগতের দৈত্যগুলি আজ নিশ্চিহ্ন এবং কুম্ভীর, সর্প, টিকটিকির মত উহাদিগের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলিই আজ বাঁচিয়া আছে। কেন?

সরীসৃপ লোপ পাইবার কারণ

জলচর হইতে উভচর জন্মিল, তাহার পর উভচর হইতে জন্মিল স্থলচর, এবং সরীসৃপের জন্ম উভচর হইতে। উহাদিগের রক্ত উভচরের রক্তের মত শীতল, সেইজন্য শীতের আগমনে উহাদিগের কার্য্যকরী ক্ষমতা হ্রাস পায়। উহারা নির্জীব ভাবে ঘুমাইয়া শীতকাল কাটাইয়া

দেয়। আবার শীত কাটিয়া গেলে উহাদিগের ঘুম ভাঙ্গে এবং উহারা কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠে। সর্প, কচ্ছপ ইত্যাদির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে। বর্ত্তমান যুগের মত প্রাচীন যুগের সরীসৃপ দেহের রক্ত বোধ হয় শীতল ছিল। স্তন্যপায়ীদিগের রক্ত হয় তপ্ত, সেজন্য ইহারা কোন ঋতুতেই নিজের কর্ম্মচাঞ্চল্য হারায় না। শীতলরক্ত সরীসৃপ যে তপ্তরক্ত স্তন্যপায়ীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, তাহার বোধ হয় ইহাও একটী কারণ।
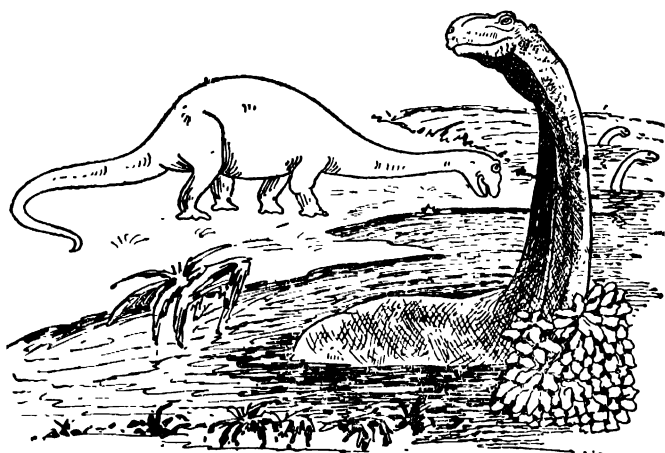
বিশালদেহ ব্রন্টসরাস

ইহারা নিরামিষাশী, ইহারা নাকি ওজনে হাজার মণ হইত।

সরীসৃপ আকারে অতিশয় বৃহৎ হইত। দেহের বিশালতা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে ইহাদিগের পক্ষে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকা সুবিধা ছিল। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। চিলের পশ্চাতে কাকের দল লাগিতে দেখিয়াছ কি? চিল আকারে কাক অপেক্ষা বড়

ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কাকের দলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না; মুখের মাংস-খণ্ড ফেলিয়া দিয়া বাঁচে। বোধ হয়, এইরূপ ব্যাপার পুরাকালে প্রায়ই ঘটিত। শীতলরক্ত বিশালদেহ মন্থরগতি সরীসৃপের সহিত যুদ্ধে, তপ্তরক্ত ক্ষুদ্রাকার চঞ্চল স্তন্যপায়ীর দল প্রায়ই জয় লাভ করিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে প্রাধান্য লইয়া এইরূপ অবিরাম সংগ্রামের ফলে সরীসৃপের ক্ষয় ও স্তন্যপায়ীর জয় হওয়ায় আজ স্তন্যপায়ী পৃথিবীব্যাপী।

সরীসৃপের দেহই বাড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক বাড়ে নাই। উহাদিগের নাশের ইহাও আর একটী কারণ। স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্ক দেহের তুলনায় বৃহৎ।

পক্ষী সরীসৃপের উন্নত সংস্করণ

পক্ষীজাতি সরীসৃপের আরও একটী উন্নত সংস্করণ মাত্র। ইহাদিগের রক্ত তপ্ত এবং ইহাদিগের মস্তিষ্কও দেহের অনুপাতে বৃহৎ। সরীসৃপ পক্ষ লাভ করিয়া হইল পক্ষী। শীতল আকাশে আশ্রয় লওয়ায়, উহার দেহের তাপরক্ষার জন্য প্রকৃতিমাতার ব্যবস্থায় ফলে পক্ষীর পালক দেখা দিল। লঘু ও তাপরক্ষক পালক উড়িবার পক্ষে অনুকূল। পক্ষী তাহার পক্ষের জন্য সর্ব্বত্রগামী হইয়া উঠিল এবং নিজের বংশধারার রক্ষার অনুকূল আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া নানা রূপ ধারণ করিল।

পক্ষ ব্যবহারের অভাবে পক্ষী উড়িবার ক্ষমতা হারাইল

কতক পক্ষী নূতন দেশে গিয়া, আত্মরক্ষার তেমন প্রয়োজন না থাকায়, ব্যবহারের অভাবে ক্রমশঃ পক্ষদ্বয়ের কার্য্যকারিতা

হারাইয়া ফেলিল। আফ্রিকার মরুভূমির উটপক্ষী, অষ্ট্রেলিয়ার উষর প্রদেশের এমু (Emu), মরিশাস দ্বীপের ডোডো (Dodo) ও মেরুপ্রদেশের পেন্‌গুইন (Penguin) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যতদিন মনুষ্য মরিশাস দ্বীপে পদার্পণ করে নাই, ততদিন ইহারা নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাইতেছিল। তাহার পর, যখন মানুষ আসিল, সঙ্গে আনিল তাহার সর্ব্বগ্রাসী লোভ ও বুভুক্ষা। ফলে, এখন আর একটিও ডোডো দেখিতে পাওয়া যায় না। পেন্‌গুইনও শীঘ্রই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে, কারণ ইহারাও সর্ব্বভূক্ মানুষকে বিশ্বাস করে। উটপাখীর পালকের লোভে মানুষ এখনও উহাকে নিঃশেষে ধ্বংস করে নাই!

বর্ম্মধারী সরীসৃপ (কুমীরের পূর্ব্বপুরুষ)

১১

স্তন্যপায়ী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব সরীসৃপের প্রাধান্যের সময় ঘটে। আদি স্তন্যপায়ীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিলে মনে হয়, উহারা আকারে ইঁদুরের মত লোমশ ও ক্ষুদ্র হইত। উহাদিগের তীক্ষ্ণ নখ ছিল এবং উহারা বৃক্ষের উপর বা ভূমিগর্ভে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করিত। উহাদিগের দন্তগুলি গঠন-কৌশলের জন্য উহারা সকল প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিতে পারিত। উহাদিগের বংশধারার পরিচয় কিন্তু আজকাল কোথাও পাওয়া যায় না।

খড়িমাটির সৃষ্টির পর স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব

পলিপাথরের যে স্তরে বর্ত্তমান যুগের স্তন্যপায়ীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সে যুগে খড়িমাটির স্তর জমাট বাঁধিয়াছে। ঐ যুগের বহুপূর্ব্বেই বিশালদেহ সরীসৃপের বংশধারা লুপ্ত হয় এবং পৃথিবীর আধিপত্য পক্ষীজাতি লাভ করে। পক্ষীর পরে স্তন্যপায়ী পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করে। সরীসৃপ বংশধারার কোন শাখায় কালক্রমে পক্ষীর আবির্ভাব ঘটে। স্তন্যপায়ীও সরীসৃপের কোন শাখার দেশ ও কালানুকূল উন্নত সংস্করণ মাত্র।

কোন জীব দেশ ও কালের প্রতিকূল কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একবার পরিত্যাগ করিলে পুনরায় উহা গ্রহণ করে না; ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। অগ্রগতি-ক্রমবিবর্ত্তন অতিক্রান্ত পথে ফিরিয়া যায় না। বিশাল জলা ও উদ্ভিদের যুগে প্রয়োজনানুসারে যে সরীসৃপের সম্মুখের পদদ্বয় পক্ষে

পরিণত হওয়ায় উহা পক্ষী হইয়াছিল, সে পুনরায় শুষ্কভূমির যুগে পক্ষত্যাগ করিয়া সম্মুখের পদ গ্রহণ করিতে পারে না। যে মূলধারা হইতে পক্ষীরূপ নূতন শাখা জন্মিয়াছিল, সেই ধারায় গিয়া স্তন্যপায়ীর শাখা অনুসন্ধান করিতে হইবে।

থেরোমর্ফ্সের পরেই স্তন্যপায়ী

সরীসৃপের প্রাচীনতম পুরুষ থেরোমর্ফসের (Theromorphs) কঙ্কালের সহিত স্তন্যপায়ীর কঙ্কালের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নিজের দেহ ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া চলাফিরা করিতে পারিত। কঙ্কালের গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহার অনুগামী বংশধরগণ অপেক্ষা স্তন্যপায়ী ইহার অতি নিকট আত্মীয়।

সাধারণতঃ থেরোমর্ফস্ আকারে নেকড়ে বাঘের মত হইত। ইহা অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এই জাতীয় জীবও বিরল ছিল না। প্রথম স্তন্যপায়ীর কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয় ইহারা ক্ষুদ্রাকার থেরোমর্ফসের উন্নত সংস্করণ। ইহারা আকারে অতিক্ষুদ্র হইয়াও বিশালদেহ আমিষাশী সরীসৃপের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিল তাহা চিন্তার বিষয়। সম্ভবতঃ আকারে ক্ষুদ্রতার জন্যই ইহারা বিশালদেহ সরীসৃপের দৃষ্টিপথে পড়িত না। ক্ষুদ্রাকার বলিয়া উহারা অতি অল্পাহারেই জীবনধারণ করিতে পারিত এবং ইহাদিগের দন্তের গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহারা সকল প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিত।

সরীসৃপ ধারা হইতে পক্ষীর জন্ম

দিনসর সরীসৃপগোষ্ঠী থেরোমর্ফসের মূলধারা হইতে জন্মিয়াছে। অন্যান্য সরীসৃপদিগের মত এই গোষ্ঠীতেও বহু প্রকারের দিনসরের

আবির্ভাব ঘটে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ছিল আমিষাশী, আবার কতকগুলি দেশভেদে খাদ্যানুযায়ী হইল নিরামিষাশী। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির মাথায় চূড়া, কতকগুলির শিং, কতকগুলির আবার আধুনিক কালের হাতির মত দাঁত গজাইত। স্তন্যপায়ীযুগের গণ্ডার, হাতি, ক্যাঙ্গারু বা পাখীর মত প্রায় দেখিতে জীবাধার, সরীসৃপযুগেই দেখা দেয়। ইহাদিগের আকারগুলিতে অদ্ভুত বৈচিত্র্য দেখা যাইত। এক জাতীয় দিনসরের আকার বর্তমান কালের হাতির মত হইলেও গলাটি এমনই দীর্ঘ হইত যে দেহের দৈর্ঘ্য গিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাতের অধিক দাঁড়াইত।

সরীসৃপ ধারার এক শাখায়, ক্রমশঃ উড়িবার উদ্যম আসিল। এই শাখাজাত সরীসৃপ অনেকাংশে দেখিতে বর্তমান কালের বাদুড়ের মত ছিল। ইহাদের দেহে পালকের পাখা হইত না, চামচিকের মত চামড়ার ডানা জন্মিত। টেরোড্যাকটাইল (Pterodactyl) গোষ্ঠী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা নানা আকারের
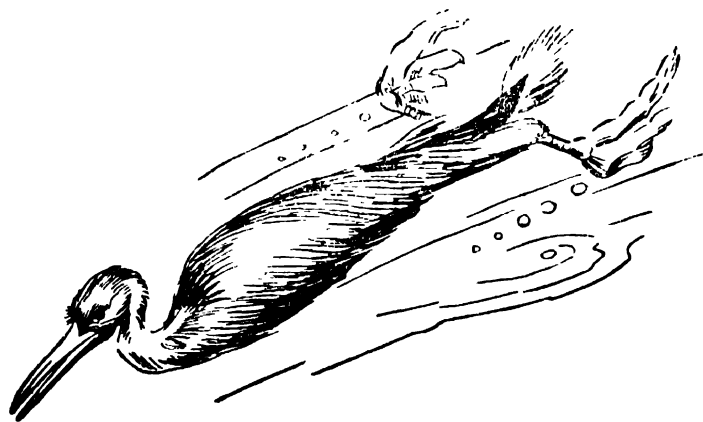
সরীসৃপ হইতে প্রথম পক্ষী

হইত। এই উড়ন্ত সরীসৃপগুলির বাদুড়ের মত ডানাও হইত, আবার পা দুইটিতে সুতীক্ষ্ণ নখরও জন্মত।

সরীসৃপ হইতে প্রথম যে পক্ষীর ধারা আরম্ভ হইল উহাতে যে আধার দেখা দিল, তাহার ডানাও ছিল না। ইহা জলে পায়ের সাহায্যে সাঁতার দিতে দিতে বেগের ঝোঁকে মাঝে মাঝে জল হইতে উঠিয়া উড়িয়া চলিত। এইরূপ জীবাধারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই হাত হইত।

প্রথম প্রকৃত পক্ষী

অবশেষে এই জীবাধারের নানা সংস্করণের শেষে প্রকৃত পাখী দেখা দিল। ইহাদিগের পালক জন্মিত, কিন্তু ইহারা উড়িতে পারিত না। উহারা অনেকটা উটপাখীর মত দেখিতে ছিল; উচ্চতায় উটপাখীর মত না হইলেও ইহার দেহখানি কিন্তু তাহার অপেক্ষাও গুরুভার হইত। ইহারা স্থলচর হইত, তখনও ইহা খেচরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভ করে নাই।

পালক লাভ করায় ইহাদিগের দেহের তাপ সংরক্ষণে সুবিধা হইল এবং ক্রমশঃ নিঃশ্বাস গ্রহণের যন্ত্রের উন্নতি হওয়ায় আবহাওয়ার সকল অবস্থাতেই ইহাদিগের কার্য্যকরী ক্ষমতা অটুট থাকিত। সরীসৃপগুলি শীতল আবহাওয়ায় অলস ও নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িত, নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করায় পক্ষীধারার সে অসুবিধা দূর হইল।

বিশালদেহ সরীসৃপগুলির ধ্বংসের কারণ

বিশালদেহ অতিভোজী সরীসৃপগুলিকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদাই আত্মঘাতী কলহে ব্যস্ত থাকিতে হইত; কিন্তু নগণ্য অল্পাহারী স্তন্যপায়ীর এ বিষয়ে ব্যস্ত থাকিবার কোন কারণ ছিল না। তাহারা প্রথমতঃ অল্প আহার গ্রহণ করিত, দ্বিতীয়তঃ যাহা পাইত তাহাতেই উহাদিগের চলিয়া যাইত। ফলে জীবনযুদ্ধে বিশালদেহ অতিভোজী সরীসৃপের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার অল্পাহারী সকভুক্ স্তন্যপায়ীর জয়ী হইবার সম্ভাবনা অধিক ছিল।

দেখিতে পাওয়া যায় ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে স্তন্যপায়ীর দেহের গঠনের বিশেষ উন্নতি ঘটিল। উহাদিগের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস পূর্ব্বগামী জীবকুলের অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হওয়ায়, বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজন ও খাদ্য হইতে সংগৃহীত কার্ব্বন সম্মেলনে কোন ঋতুতেই উহাদিগের দেহতাপের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটিত না। ফলে শীতলরক্ত সরীসৃপ ঋতুভেদে হইত কর্ম্মঠ ও সজীব বা কখন অলস ও নিৰ্জ্জীব, অপর পক্ষে তপ্তরক্ত স্তন্যপায়ীর কর্ম্মক্ষমতা কিন্তু ঋতুর উপর বিশেষ নির্ভর করিত না।

স্থানভেদে জীবের বিভিন্ন গাত্রাবরণ লাভ

পক্ষীজাতি পালক ও স্তন্যপায়ী গাত্রাবরণরূপে লোম লাভ করায় ইহারা প্রতিকূল জলবায়ুতেও কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিত না। স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র তিমি মৎস্য জলে গিয়া বাস করিয়াছে। ইহার আর লোমের প্রয়োজন না থাকায় অধিকাংশই খসিয়া গিয়াছে, তবে উহার ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে কয়েকগাছি স্থূল ও কঠিন লোম এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তিমি মেরুপ্রদেশের অতি শীতল জলে গিয়া বাস করায় লোমের পরিবর্ত্তে চর্ম্মের নিম্নেই এক স্তর স্থূল মেদাবরণ লাভ করিয়াছে, সেইজন্য দেহের তাপ রক্ষায় ইহা কোনই অসুবিধা ভোগ করে না; বরং মেদাবরণ থাকায় তাহার জলে ভাসিয়া থাকিবার সুবিধা হইল। স্বল্পতম ব্যবস্থায় অধিকতম ফল পাওয়ার প্রতি প্রকৃতির সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে।

স্তন্যপায়ীর পদগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়ায় উহা দ্রুতগতি লাভ করিল। উহা তীক্ষ্ণতর শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় লাভ করায় উহার কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে প্রধান তারতম্য ঘটিল উহার মস্তিষ্কে। স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্ক হইল সরীসৃপের অপেক্ষা বৃহত্তর ও জটিলতর। সুতরাং বুদ্ধির কাছে দেহের শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল।

স্তন্যপায়ীর ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজনানুরূপ ক্রমোন্নতি

মস্তিষ্কের উন্নতি নির্ভর করে ব্যবহারের উপর। অলসের অব্যবহৃত মস্তিষ্কের অবনতিই ঘটে। দেশকালানুসারে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া

প্রয়োজনমত চঞ্চল স্তন্যপায়ীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ করিয়া চারিটি কার্য্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ভূমি খনন করিয়া ভূগর্ভে বাস, উভচর জীবন হইতে শেষে সামুদ্রিক জীবন, বৃক্ষজীবন ও স্থলে বাসের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমবিবর্ত্তন ঘটিল।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দীর্ঘ ও লাঙ্গুল ক্ষুদ্র হইল। স্থলে ছুটাছুটির উপযোগী দেহে শক্তিশালী পেশী দেখা দিল। বানরের বৃক্ষজীবনের উপযোগী শাখা ধরিবার দীর্ঘ ও সরু লাঙ্গুল গজাইল। ক্যাঙ্গারু, বানর, বনমানুষ ইত্যাদির সম্মুখের পদদ্বয় চলিবার অপেক্ষা ধরিবার জন্য অধিকতর ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই অভ্যাসবশতঃ ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে মানব-দেহে জীবের সম্মুখের পদদ্বয় দেহের ভার বহনের কার্য্য হইতে মুক্তি পাইয়া হস্তে পরিণত হইল।

হস্তেন্দ্রিয়ের ক্রমোন্নতি

মানুষের হাতের রচনাকৌশল অতিশয় চমৎকার। প্রকৃতি দেবী এ বিষয়ে যে গঠননৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সৃষ্টিতে বহু জীবই মানুষের হাতের মত অঙ্গ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের হাত যেন প্রকৃতি দেবীর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কাঁকড়া বা চিংড়ীর দাঁড়া, পাখীর নখর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর সম্মুখের পা দুইটি এবং মানুষের নিকটতম আদর্শ বানরের হাত দুইটি দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী জীবসৃষ্টির পদে পদে হস্তেন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করিতে করিতে সর্ব্বশেষে মানুষের হাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বানর জাতির বহু শাখায় উদ্ভুত বানরের হাতে পাঁচটি আঙ্গুলও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষ তাহার বুড়ো আঙ্গুল যে অসংখ্য ভাবে ব্যবহার করে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও ব্যবহার বানর জাতি

করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা যেমন গুঁড়া জিনিষ হাতে তুলিতে পারি, বানর কিছুতেই ঐরূপ পারে না।

মানুষের বুড়া আঙ্গুল না হইলে একেবারেই চলে না। মানুষের হাত যে এত কাজ করিতে পারে, উহার মুলে উহার বুড়া আঙ্গুলটি। মানুষকে অকেজো করিতে হইলে তাহাকে তাহার বুড়া আঙ্গুল হইতে বঞ্চিত করা প্রয়োজন। এই কারণেই দ্রোণাচার্য্য, আপন প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিবার জন্য, একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাহার বুড়া আঙ্গুলটি চাহিয়াছিলেন।

কেমন করিয়া প্রকৃতি দেবী ধীরে ধীরে তাহার সৃষ্টিচক্রের পর্ব্বে পর্ব্বে জীবাধারগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কার্য্যকর করিয়া তুলিয়াছেন তাহা এই চিত্র হইতে বেশ বুঝা যায়।
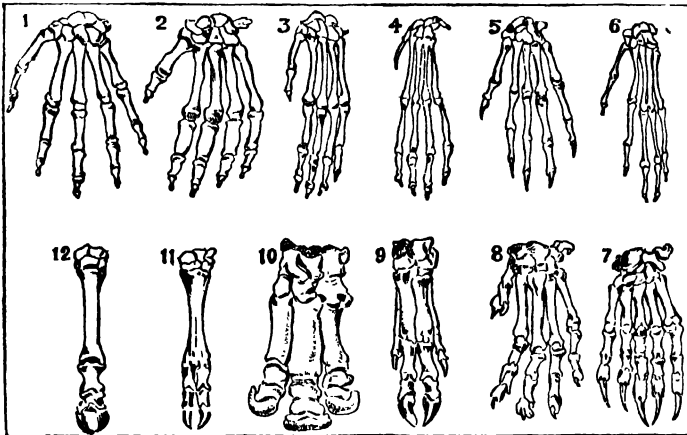
সৃষ্টিচক্রের পর্ব্বে পর্ব্বে হস্তেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ

১। মানুষের ২। গোরিলা ৩। ওরাং ওটাং ৪। স্পাইডার মনকি (Spider Monkey) ৫। মার্শ্মোসেট্ ৬। লেমুর ৭। ভল্লুক ৮। সিংহ ৯। শূকর ১০। গণ্ডার ১১। গরু ১২। ঘোড়া

আধুনিক ঘোড়ার পায়ের খুব গোজাতির মত দ্বিধা বিভক্ত নয়; গণ্ডারের খুব ত্রিধা বিভক্ত, শূকরের খুব চারি ভাগে বিভক্ত, সৃষ্টির এই পর্ব্বে নখ দেখা দিয়াছে।

তাহার পর সিংহাদি জীবাধারে সম্মুখের পা থাবায় পরিণত হওয়ায় হাতের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। সিংহের থাবার কঙ্কাল দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী তখনও ঠিক করিতে পারেন নাই কোন পথে অগ্রসর হইবেন। তাহার পর তিনি ভল্লুকের থাবার আঙ্গুলগুলি সমান করিয়া দেখিলেন থাবার কার্য্যক্ষমতা বাড়ে কি না। দেখা গেল ভাল্লুক জাপটাইয়া ধরিতে পারে, পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু উন্নতি হইল। কিন্তু নখে অসুবিধা হইতে লাগিল দেখিয়া প্রকৃতি এ পথ যেন ছাড়িয়া দিলেন।

তিনি যে নূতন পথে অগ্রসর হইলেন তাহা লেমুরের হাত দেখিয়া মনে হয়। এই জীবাধারে আঙ্গুলগুলি করিলেন অসমান, নখর গুলিও করিলেন ছোট ছোট। আঙ্গুলগুলির মধ্যে একটিকে খুব ছোট করিয়া ক্রমশঃ আর চারটিকে এইটির সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নানা আধারে আঙ্গুলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি দিতে সক্ষম হইলেন। কি অনুপাতে আঙ্গুলগুলিকে গড়িলে হাতের কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তাহা আবিষ্কার করিতে প্রকৃতিদেবীকে বহু কোটী বৎসর সাধনা করিতে হইয়াছে।

স্তন্যপায়ী ধারায় ব্যতিক্রম

বাদুড়ের দেহে সম্মুখের হাত বা পা দুইটি পরিণত হইল পক্ষে। স্তন্যপায়ী হইয়াও তিমির জলে বাস। তিমিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তন্যপায়ী। জলে বাস বলিয়া উহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেহের ভার বহন করিতে হয় না, ইহা জলে ভাসিয়া বেড়ায়। সেইজন্য চল্লিশ হস্ত

দীর্ঘ তিমিও বিরল নহে। আবার বাদুড়কে বায়ুতে ভর করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে হয়, সেইজন্য ইহার আকার অন্যান্য স্তন্যপায়ীদিগের দেহের অনুপাতে লঘুতম।

উদ্ভিদভোজী জীবগুলি পদের অঙ্গুলি সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের জন্য আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিতে বহুদূর গমনাগমন করিতে পারে। জীব যখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বা বৃক্ষে দ্রুতগতি লাভের অনুকূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ লাভ করিতেছিল, তখন উহার মুখবিবরে গুল্ম, তৃণ, বৃক্ষের ত্বক, পোকামাকড় বা অন্যান্য পশু ধরিয়া খাইবার উপযুক্ত দন্তরাজি ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীগুলি দেশ ও কালের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করিয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকল স্থান হইতেই স্তন্যপায়ীর আহার সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা থাকায়, উহার দেহের গঠন ও দন্তের মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক লক্ষিত হয় না।

জীবের এক অঙ্গের পরিণতি বা হ্রাসবৃদ্ধি তাহার অন্যান্য অঙ্গের অনুপাতের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক অঙ্গ বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হওয়ায়, দেশ ও কালের অনুকূল সেই কার্য্যের উপযোগিতার জন্য দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল বা সবল আকার স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। যে কার্য্যের জন্য উহার সৃষ্টি, দেশ ও কালের অনুকূল উপযোগিতা দিয়াই প্রকৃতি উহাকে গড়িয়া তুলেন। অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতের উপর উহার আকার বা গঠন নির্ভর করে না। জীবের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাধীন ভাবেই প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল হ্রাস বৃদ্ধির বা গঠননৈপুণ্য ঘটে। সেইজন্য স্তন্যপায়ীর মধ্যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন অনুযায়ী অসংখ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ীর লুপ্ত শাখা

সে সুদূর অতীতে, খড়িমাটির সৃষ্টির যুগে, ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীর জীবধারা হইতে দেশ ও কালভেদে যে অসংখ্য শাখা সৃষ্টি হয়, মনে করিও না তাহার সকলগুলির বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। কত যে শাখা, দেহের গঠন দেশ ও কালের প্রতিকূল হওয়ায়, কিংবা উহারা দেশ ও কালের অনুকূল জীবনযাত্রায় আপনাদিগকে মানাইয়া লইতে না পারায়, লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। কালে যে শাখাগুলিতে দেশ ও কালের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা দিল, সেগুলির কোনটীর পরিণতি হইল বানর, কোনটীর বা গরু, কোনটীর বা হস্তী, কোনটীর বা অশ্ব, আবার কোনটী বা হইল ব্যাঘ্র শ্বাপদাদি। এইরূপে অসংখ্য প্রকার স্তন্যপায়ীর শাখা প্রশাখা আজিও পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ ও কালের উপযোগী সহগুণবৃদ্ধির অনুপাতে জীবের মস্তিষ্কও উন্নতি লাভ করিতে থাকে।
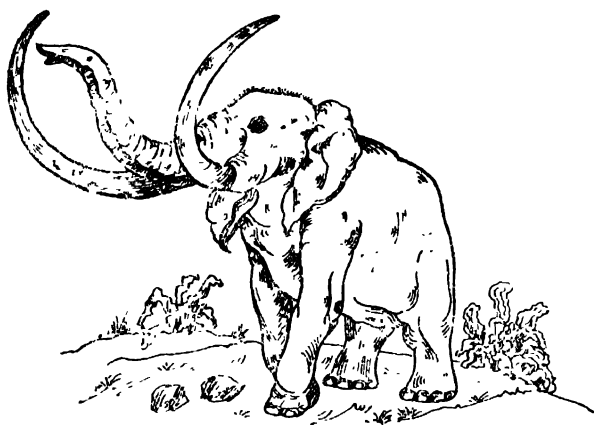
প্রাচীন বৃহদাকার হস্তী

স্তন্যপায়ীর বহু প্রাচীন শাখা আজ বিলুপ্ত। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিয়া উহাদিগের অস্তিত্বের সংবাদ আমরা জানিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের হস্তীর পূর্ব্বগামীদিগের মধ্যে প্রাচীন বৃহদাকার ম্যামথ (Mammoth), ম্যাষ্টডন (Mastodon) ইত্যাদির চিহ্নও আজ পৃথিবীতে পাওয়া শক্ত। ম্যামথের কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয়, উহা আমাদের হস্তীর মত দেখিতে ছিল ; তবে আকারে ছিল সামান্য বৃহৎ। ইহাদিগের গাত্রে বর্ত্তমান যুগের সদ্যোজাত হস্তীশাবকের মত লোম জন্মিত। ম্যাষ্টডন বর্ত্তমান যুগের হস্তীর মতই দেখিতে ছিল, প্রভেদের মধ্যে উহাদিগের মস্তকটি হইত বৃহদাকার এবং দন্তের গঠনও হইত বিভিন্ন। সম্ভবতঃ জীবধারার এই হস্তীশাখা কোন অতি প্রাচীন এক দীর্ঘনাসিকা ক্ষুদ্রাকার স্তন্যপায়ী জীব হইতে আরম্ভ হয়। প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মধ্যে বহু প্রকারের ক্রমবর্দ্ধমান দীর্ঘনাসিকাপ্রাপ্ত স্তন্যপায়ী জীবকুলের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান যুগের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, গো, অশ্ব ইত্যাদি স্তন্যপায়ীর পূর্ব্বপুরুষগণের নানাপ্রকার কঙ্কাল আমরা পলিপাথরের স্তরে স্তরে প্রোথিত পাইয়াছি।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূল

প্রকৃতিতে দেখা যায় ক্ষুদ্র হইতে ক্রমশঃ বৃহদাকার জীব জন্মে। স্তন্যপায়ী ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। প্রস্তরীভূত কঙ্কালের মধ্যে স্তন্যপায়ীর যে অতিকায় লুপ্ত সংস্করণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় উহাদিগের দেহের আকারের বৃদ্ধির তুলনায় মস্তিষ্ক উন্নতি লাভ করে নাই ; সেই কারণে উহারা আপনাদিগকে দেশ ও কালের অনুকূল করিয়া লইতে পারিল না। তাই আজ তাহারা বিলুপ্ত।

বর্ত্তমান যুগের স্তন্যপায়ী, অন্যান্য শাখার ক্ষুদ্রাকার জীব হইতেই ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে, আজ এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা লুপ্ত

অতিকায় স্তন্যপায়ীর রুগ্ন সংস্করণ নহে। অশ্বের আদিপুরুষ এগার ইঞ্চি মাত্র উচ্চ হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে ক্রমবিবর্ত্তন অগ্রগতি বিশিষ্ট। উহা অতিক্রান্ত পথে ফিরিয়া যাইতে জানে না।

সৃষ্টির গতি সরল হইতে জটিলতার দিকে। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে জটীলতা। জৈবসৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময়, অতএব জটিলতম।

প্রথমে এককোষময় প্রোটোপ্লাজম্; উহাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বহু-কোষময় জীবাধার গঠিত হইল। জলজ শ্যাওলা ঐ বহুকোষময় জীবাধারেরই নাম। তাহার পর উহাই ক্রমশঃ জটিলতর রূপ গ্রহণ করিতে করিতে উদ্ভিদে পরিণত হইল। উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ উহার পুষ্পে। পুষ্পের আবির্ভাবে কীটপতঙ্গাদির দৃতীয়ালী আরম্ভ হইল, ফলে উদ্ভিদ্‌জগতে বৈজীসৃষ্টির অবকাশ ঘটিল।

জীবপ্রবাহের অন্য ধারায় শ্যাওলার বুকে জন্মিল 'ছ্যাতা'। 'ছ্যাতা' শ্যাওলার ভুক্ত অন্নরস পান করিয়া বাঁচিয়া রহিল। ইহাই প্রাণীর পূর্ব্বাভাস। তাহার পর পর্ব্বে পর্ব্বে প্রাণী অগ্রসর ও উন্নত হইতে লাগিল।

প্রথম পর্ব্বে প্রাণী কেবলমাত্র আহার পাইলে পরিপাক করিতে শিখিয়াছে। তখন উহা আহার সংগ্রহ করিবার উপায় লাভ করে নাই। কেবলমাত্র কতকগুলি খাদ্য পরিপাক করিবার পাত্র একত্র হইয়া জীবাধার গড়িল। এইরূপ অবস্থার ফলে স্পঞ্জ জন্মিল। স্পঞ্জের অনেকগুলি পেট ও মুখ, আর কোন ব্যবস্থাই হয় নাই; আকারও নির্দ্দিষ্ট নহে।

দ্বিতীয় পর্ব্বে অনির্দ্দিষ্ট আকার নির্দ্দিষ্ট গোলাকার হইল, বহুপেট গিয়া একটিতে দাঁড়াইল। ফলে প্রবালকীটের জন্ম হইল।

কীট পতঙ্গের দূতীয়ালী
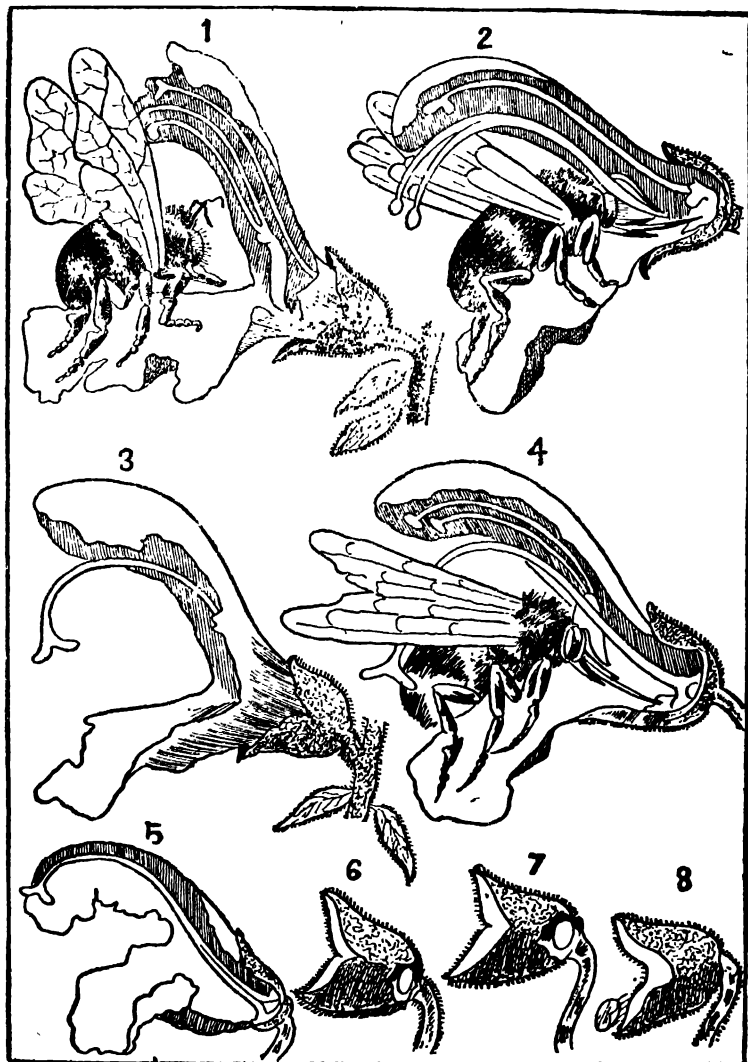
তৃতীয় পর্ব্বে পেটের উপর মস্তক গজাইল। পদ লাভ না করিয়াও গতি লাভ হইল। এইরূপে জীবাধারের জল হইতে স্থলের দিকে গতির অনুকূল ব্যবস্থা হইল। ফলে ক্রমশঃ কেঁচো, কৃমি, জোঁক ইত্যাদি রূপ লইল।

চতুর্থ পর্ব্বে দেহ অক্ষত রাখিয়া স্থলে চলিবার উপযোগী দেহে কতক-গুলি পদ জন্মিল। কেন্নো ও তেঁতুলেবিছা এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তাহার পর দেখা গেল, গতির জন্যও দেহ তুলিয়া রাখিবার জন্য বহুপদের কোন প্রয়োজন নাই। ফলে বহুপদ হইতে অষ্টপদ (মাকড়সা), ষড়পদ (পিপীলিকা) ও চতুষ্পদের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ প্রয়োজনের জন্য সম্মুখের পদদ্বয়, ধরিবার মত কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকায়, কোন কোন জীবে (খরগোস) ইহা ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইল এবং দাঁড়াইবার সুবিধার জন্য কোন কোন জীবে (ক্যাঙ্গারু) লাঙ্গুল সবল ও দৃঢ় হইল।

পঞ্চম পর্ব্বে ক্রমশঃ জীবের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত মাংসপেশী দেহে জন্মিলে দাঁড়াইবার জন্য আঙ্গুলের প্রয়োজন রহিল না। অন্যদিকে সম্মুখের পদদ্বয় দিয়া পোকা, মাকড়, মাছি তাড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া শাখা আদি ধরিবার কার্য্যে সুন্দরভাবে ব্যবহৃত থাকায় লাঙ্গুলের কোনই প্রয়োজন রহিল না। ফলে বানরজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি লাঙ্গুলহীন বানর বা কুৎসিত নর (গোরিলা) জন্মিল।

এইরূপে প্রকৃতিদেবী তাঁহার পরীক্ষাগারে যেন নানা জীবাধার ভাঙ্গা গড়া করিতে করিতে কোন এক শুভক্ষণে মানব জাতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য অতিকায় ও শক্তিশালী স্তন্যপায়ীর তুলনায় আকারে ও শক্তিতে উহা নগণ্য হইলেও উহার মস্তিষ্ক হইল অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্করণের। প্রথম মানব হইল আকারে বামন ও যুগের অনুপাতে

মস্তিষ্কে অতিকায়। ফলে বামনমানবের বংশধরগণ আজ পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মানবক

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীর জনিত জন পাবন।
কেশবধৃত বামনরূপ—
জয় জগদীশ হরে॥

Library Form No. 5
Books are issued for seven days only.
Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the Borrowers.
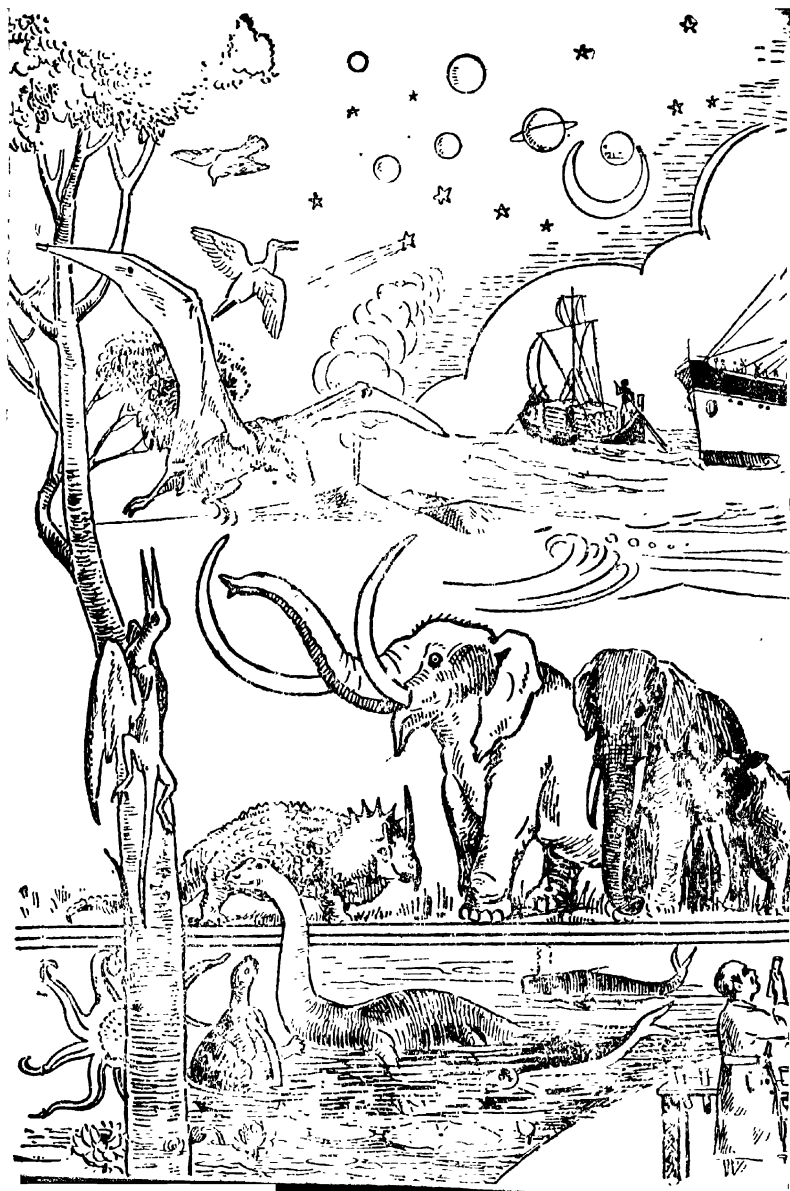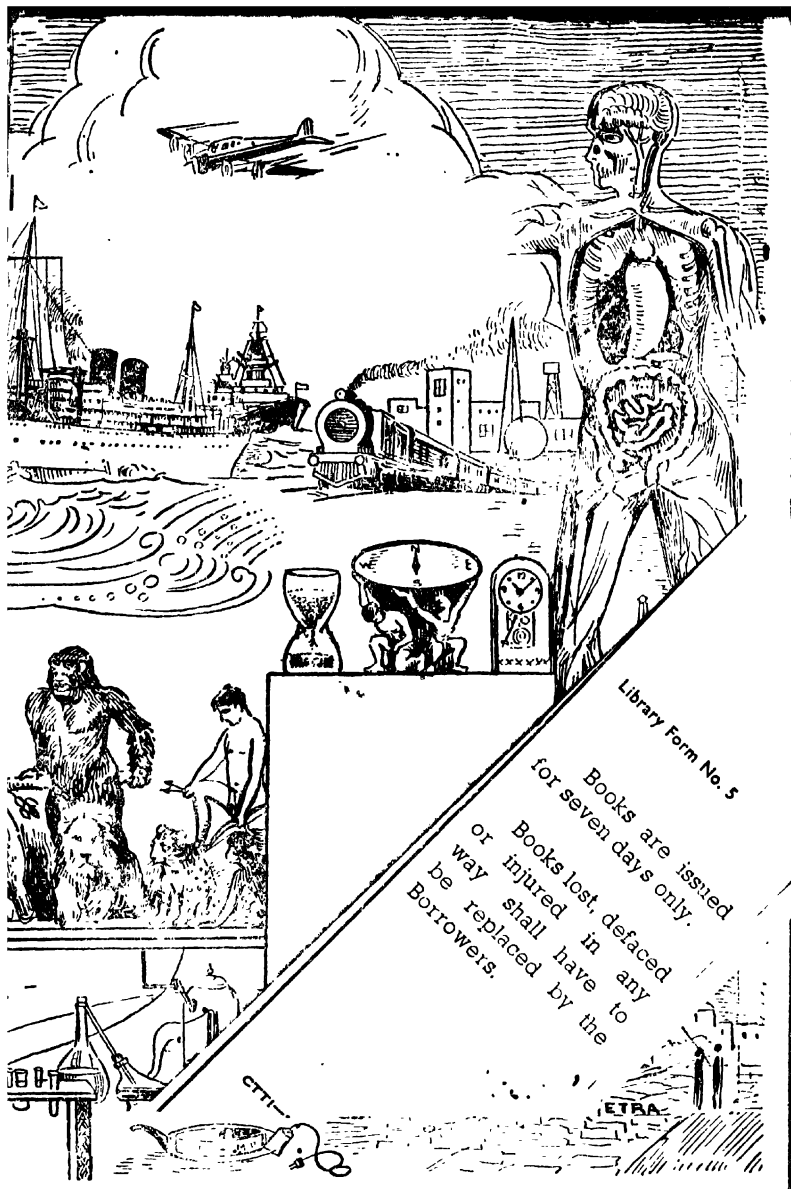
বাংলার ঘরে ঘরে

বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে

বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রণীত

প্রকাশিত

১। কি ও কেন ?

২। বিচিত্র এই সৃষ্টি

৩। অদ্ভুত কথা

৪। কারিগরের বাহাদুরি

৫। ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !

৬। প্রাণের স্রোত

৭। অতি পরিচিতের পরিচয়

৮। সবুজ কি অবুঝ ?

যন্ত্রস্থ

৯। প্রাণী জগৎ

১০। বহুরূপী তেজ

১১। বিজলীর কীর্ত্তি

১২। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

পাতায় পাতায় ছবি ; সুদৃশ্য বাঁধাই

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১।০ মাত্র

প্রকাশক—

The

Bengal Mass Education Society

99-1F, Cornwallis Street, Shambazar.

CALCUTTA-4.